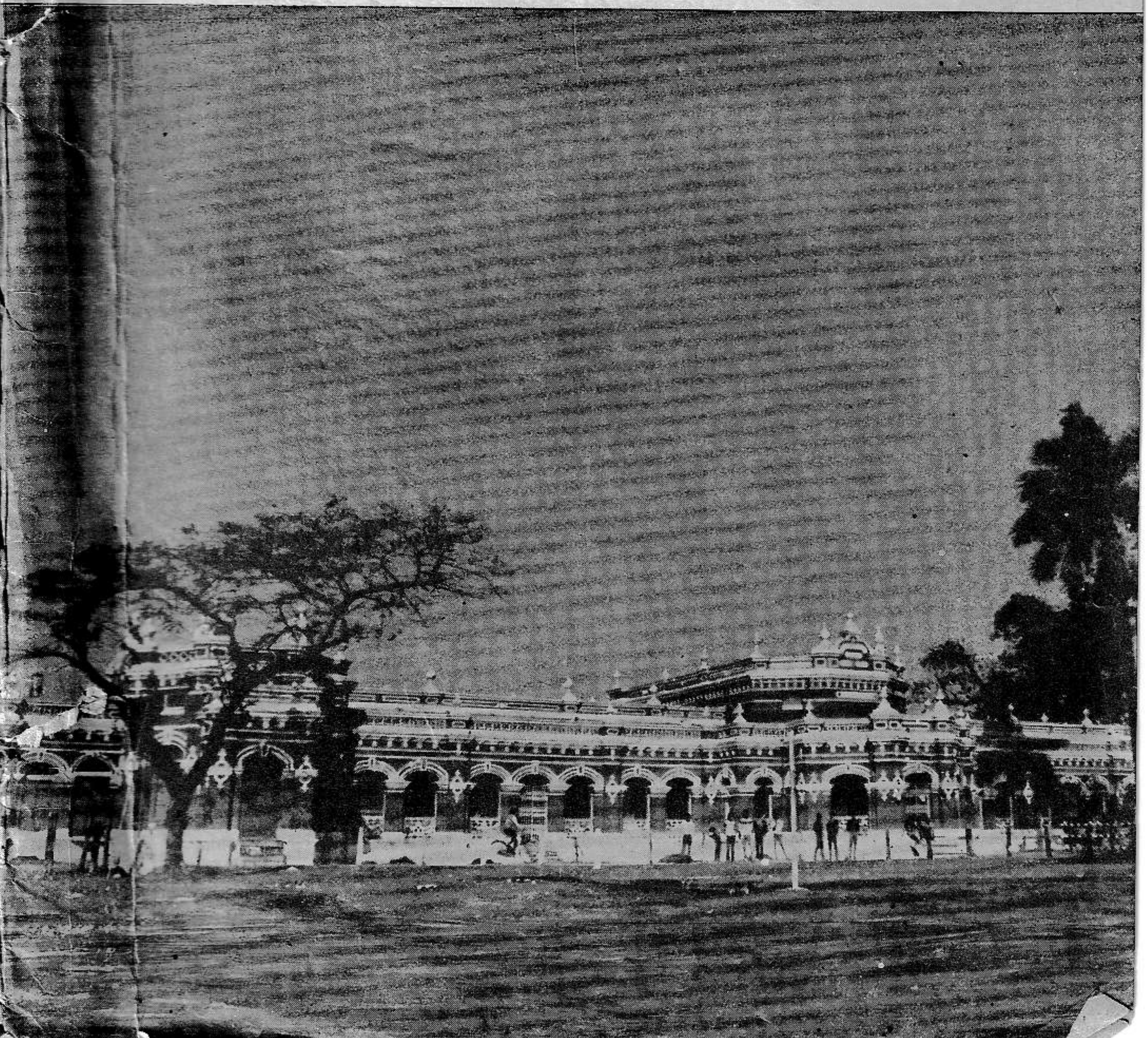
স্মরণিকা

শতবর্ষ পূর্তি উৎসব

আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল (ভিক্টোরিয়া) কলেজ



"স্মরণিকা"

* * * * * * * *

★ (৪ হইতে ৯ই মার্চ) ★
১৯৮৯

আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল (পূর্বতন ভিক্টোরিয়া) কলেজ, কোচবিহার ।
শতবর্ষ উদ্‌যাপন কমিটি—১৯৮৮-৮৯

সম্পাদনায় :

অরুণ কুমার ঘোষ
ও
সমরেন্দ্র নাথ সাহা] —যুগ্ম-আহ্বায়ক

প্রধান উপদেষ্টা :

ডঃ জীবন কুমার মুখোপাধ্যায়

ছাত্র সম্পাদক :

সনৎ কুমার ঘোষ

রূপায়ণে :

বেনু তরফদার

প্রচ্ছদ পরিকল্পনায় :

সুবোধ সেন

প্রচ্ছদ চিত্র :

সাগর সাহা

অলংকরণে :

বিকাশ কান্তি দত্ত চৌধুরী

প্রকাশনায় :

শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন কমিটি

মুদ্রণে :

প্রেস বলাকা, কোচবিহার ফোন নং : ৮২৮
মডার্ণ প্রিন্টার্স, ,,
ভোলানন্দ প্রেস, ,,
উমা প্রিন্টিং ওয়ার্কস, কোচবিহার।

শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন কমিটির পক্ষে সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক উপরোক্ত প্রেস সমূহ হইতে মুদ্রিত ও উৎসব প্রাঙ্গন থেকে প্রকাশিত।

Ajoy Acharya
Deputy Secretary

प्रधान मंत्री कार्यालय
नई दिल्ली ११००११
Prime Minister's Office
NEW DELHI 110011

No. 625/DS(P)/88

November 25/28, 1988

Dear Dr. Mukherjee

The Prime Minister sends his best wishes for the centenary celebrations of the Acharya Brojendra Nath Seal College, Cooch Behar to be held from 15th to 21st December, 1988.

With regards,

Yours sincerely,
Sd/-AJOY ACHARYA

Dr. Jiban Kumar Mukherjee
General Secretary
CENTENARY CELEBRATION COMMITTEE
Acharya Brojendra Nath Seal College
Cooch Behar, West Bengal.

নং ২২৩০ ডি. ও. সি. এম.

২৪/২/৮৯

মুখ্যমন্ত্রী

পশ্চিমবঙ্গ

কুচবিহার আচার্য্য ব্রজেন্দ্র নাথ শীল মহাবিদ্যালয়ের শতবর্ষ পূর্তি উৎসব আগামী ৪ থেকে ৯ মার্চ, ১৯৮৯ অনুষ্ঠিত হচ্ছে জেনে আনন্দিত হয়েছি।

শিক্ষা প্রসারে এই মহাবিদ্যালয়ের ঐতিহ্য শতাব্দী-প্রাচীন। সেই ঐতিহ্যের সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ খুবই জরুরী। শিক্ষার মান ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখার কাজে সংশিলষ্ট সকল-পক্ষ যত্নবান থাকবেন, এ বিশবাস রাখি।

মহাবিদ্যালয়ের শতবর্ষ পূর্তি উৎসবের সাফল্য কামনা করি।

স্বাক্ষর

(জ্যোতি বসু)

শ্রী সমরেন্দ্র নাথ সাহা
যুগ্ম সম্পাদক,
শতবর্ষ উদ্‌যাপন কমিটি,
আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাবিদ্যালয়,
কুচবিহার।

सत्यमेव जयते

মন্ত্রী
কৃষি বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
মহাকরণ, কলিকাতা

ডি. ও. নং...................... তাং.....................১৯........

আচার্য্য ব্রজেন্দ্র শীল মহাবিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান যথোপযুক্তভাবে পালনের জন্য যারা উদ্যোগী হয়েছেন, তাদের জানাই আমার আন্তরিক অভিনন্দন।

এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেরূপ মহামনীষীবৃন্দের আশীর্বাদপুষ্ট তা সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভাগ্যে মেলে না। এই মহ্যাবিদ্যালয় বহন করছে আচার্য্য ব্রজেন্দ্র নাথ শীলের মত একজন সর্ববিদ্যা-বিশারদের পবিত্র স্মৃতি।

ব্রজেন্দ্র শীল মহাবিদ্যালয়ের (পূর্বতন ভিক্টোরিয়া কলেজ) ছাত্র হিসাবে তাঁর স্মৃতির প্রতি আমার সুগভীর শ্রদ্ধা জানাবার এই সুযোগে আমি ধন্য ও কৃতার্থ।

শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তাগণকে এবং অনুষ্ঠানে সমাগত বর্তমান ও পূর্বতন সকল কৃতী ছাত্রগণকে জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা। আমি আশা করি আচার্য্যদেবের স্মৃতিমন্ডিত এই মহাবিদ্যায়তন দেশের মাঝে তার অতীত ঐতিহ্য অক্ষুন্ন রাখবে এবং সুশিক্ষা প্রসারের মাধ্যমে জনহিতে রত থাকেবে।

স্বাঃ—
(কমল গুহ)
১-৩-৮৯

মন্ত্রী
তপশিলী ও আদিবাসী কল্যাণ
ঝাড়গ্রাম সংক্রান্ত বিষয়ক দপ্তর।
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
মহাকরণ
কলিকাতা।

আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল (ভিক্টোরিয়া) কলেজের শতবর্ষ পূর্তি উৎসব অনুষ্ঠানের সংবাদ সকলের কাছেই খুব আনন্দের। আমি কলেজের প্রাক্তন ছাত্র, তাই আমার কাছে তা অধিকতর আনন্দের। আমরা আমাদের সংগ্রামী জীবনের পাথেয় বহুলাংশেই সঞ্চয় করে থাকি আমাদের বিদ্যায়তনে, তাই আমার ছাত্রজীবনের উষ্ণস্মৃতি আজ শতবর্ষ অনুষ্ঠানের পুর্ব্বমুহূর্তে আমাকে আনন্দে বিভোর করে তুলছে, এবং আমি আমার অন্তরের সেই আনন্দকে সম্পূর্ণভাবে সংযুক্ত করে দিতে চাই এই উৎসব অনুষ্ঠানের সঙ্গে। আমাদের সকলের সমবেত আনন্দে ও শুভেচ্ছায় অনুষ্ঠান পূর্ণ সাফল্যলাভ করুক।

স্বাঃ /-
(দীনেশচন্দ্র ডাকুয়া)

১লা মার্চ্চ, ১৯৮৯

কান্তি বিশ্বাস
মন্ত্রী
শিক্ষা বিভাগ (প্রাথমিক ও মাধ্যমিক)
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

ই এম এস (প্রা+মা)/১০৮৩৮/৮৮

তারিখ ২৪শে নভেম্বর, ১৯৮৮

শুভেচ্ছা

কুচবিহার জেলার আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল কলেজ আগামী ১৫—২১ ডিসেম্বর, '৮৮ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শতবার্ষিকী উৎসব উদ্‌যাপন করতে চলেছে জেনে প্রীত হয়েছি।

একটি কলেজের এত দীর্ঘকালের ইতিহাস আজ এক অনন্যসাধারণ ঘটনা। এই কলেজটি দীর্ঘকাল ধরে দেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলে শিক্ষা প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে তা আজ সকলের কাছেই সমাদৃত। আশা করি আগামী দিনেও কলেজটি সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতায় যথাযথ ভূমিকা পালন করে যাবে।

অনুষ্ঠানের সাফল্য কামনা করে অধ্যাপক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আমার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

স্বাক্ষর—
(কান্তি বিশ্বাস)
২৪।১১।৮৮

ডঃ জীবন কুমার মুখার্জী,
সাধারণ সম্পাদক,
আচার্য বি, এন, শীল (ফরমারলি
ভিক্টোরিয়া) কলেজ
শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন কমিটি,
এবং
ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক,
আচার্য বি, এন, শীল কলেজ,
কুচবিহার।

Seal

Prof. BHASKAR RAY CHAUDHURI
M.D. (Cal.), Ph.D. (Edin.), F.R.C.P.
Vice Chancellor

Phones : 31-1288, 31-1536
31-5250, 38-0071

SENATE HOUSE
CALCUTTA–700073

November 29, 1988

I am happy to learn that Acharya Brojendra Nath Seal College, Cooch-Behar, has completed 100 years of its existence and the authorities are going to celebrate its centenary in a befitting manner. During these long years the College has rendered commandable services towards dissemination of collegiate education to the students of that part of West Bengal. It played a very important role when there was a few colleges of this type in that region. On this happy occasion I convey my feliciations to the organisers and wish the College a splendid future.

S/d-
(B. Ray Chaudhuri)
Vice-Chancellor

ACHARYA
RAJIV GANDHI
Upacharya
NEMAI SADHAN BOSE

VISVA-BHARATI

FOUNDED By
RABINDRANATH TAGORE

SANTINIKETAN 731 233
WEST BENGAL, INDIA
Telephone . BOLPUR 751 (6 lines)
Telex . 203 201 RABI IN

SEAL

Ref. No. VC/M. 9

November 21, 1988

Dear Shri Mukherjee,

Kindly accept my sincere thanks for your letter intimating that your College has made elaborate arrangements for observing the Centenary of the College.

It is a proud privilege for the students and faculty members of the College to be associated with an institution which bears the most respected memory of late Acharya Brojendra Nath Seal. Acharya Seal besides being one of the greatest philosophers and thinkers of modern India, was a pioneer in the field of higher education in Bengal and set an example of "plain living and high thinking" in his own life. I believe that this premier educational institution of the eastern region of India will fulfil its commitments to the community in years to come.

I hope that the institution may go forward towards its bi-centenary retaining its past tradition and modern outlook in education.

Yours sincerely,
S/d-
(Nemai Sadhan Bose)

Dr. Jiban Kumar Mukherjee
General Secretary
Acharya B. N. Seal Centenary Celebration
Committee
Acharya Brojendra Nath Seal College
Cooch Behar, West Bengal.

Professor Mohit Bhattacharya
Vice-Chancellor

Seal

THE UNIVERSITY OF BURDWAN
BURDWAN, WEST BENGAL

Phone : BDN. { 2298
2371-75 Ext. 16

Resi. : BDN. { 2169
2371-75 Ext. 70

D.O. No. V/M-4/334
Dated, the 16th November, 1988

Dear Dr. Mukherjee,

I am glad to learn that the Acharya Brojendra Nath Seal College, Cooch Behar, West Bengal is going to celebrate its Centenary in the month of December 1988.

I hope the tradition that has been built up by this College through its association with eminent academicians and literary critics in different fields will be followed.

I convey my warmest wishes and congratulations to the teachers, students and the members of the staff of your College through you and I wish the Centenary Celebration of the College a grand success.

With best wishes,

Yours sincerely,
Sd/-
(M. Bhattacharya)

Dr. Jiban Kumar Mukherjee,
General Secretary,
Acharya B. N. Seal,
Centenary Celebration Committee,

and

Officer-in-Charge,
Acharya B. N. Seal College,
Cooch Behar,
West Bengal.

PHONE : BAGDOGRA { Office : 255
Res. : 324

UNIVERSITY OF NORTH BENGAL

Prof. K. N. Chatterjee.
Vice-Chancellor

SEAL

P.O. NORTH BENGAL UNIVERSITY
Raja Rammohunpur : Dt. Darjeeling
West Bengal, India, Pin—734430

No. 41/89/VC-89

February 23, 1989

MESSAGE

Centenary Celebration is an important milestone in the life of any institution. Acharya Brojendra Nath Seal College, Cooch Behar can legitimately feel a sense of fulfilment in this regard.

I congratulate the General Secretary of the Centenary Celebration Committee for his zeal and efforts in bringing out the Souvenir on the auspecious occasion and wish all success to the Celebration.

Sd/-
(K. N. Chatterjee)
Vice-Chancellor
23/2/89

সচিব
উচ্চ-শিক্ষা
শিক্ষা বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
আধা-সরকারী পত্র নং .. ..
তারিখ. কলিকাতা...... .. ..

A. K. Chatterjee, IAS
SECRETARY
HIGHER EDUCATION
EDUCATION DEPARTMENT
Government of West Bengal

Dated, Calcutta, The 16.11.1988

MESSAGE

The Centenary celebration of Acharya Brojendra Nath Seal College, Cooch Behar, is a landmark in the development of higher education in North-Bengal. The College was established by the Maharaja of Cooch Behar in 1888. Many of its students have distinguished themselves in later life.

Acharya Brojendra Nath Seal, an outstanding educational personality of Bengal had been associated with this college for a long period of 15 years.

I sincerely hope that this College will continue to maintain its glorious tradition in the coming years.

S/d-
***A. K. Chatterjee*, I. A. S.**
Secretary to the Government of West Bengal
Education (Higher Education) Department

Shri Anil Kumar Basak
President
West Bengal Council Of
Higher Secondary Education

SEAL

BIKASH BHAVAN
NORTH & EAST BLOCK (2nd Floor)
SALT LAKE, CALCUTTA-700091
PHONE NO. : 37-4984 (Office)
46-4579 (Res.)
&
43, KAILASH BOSE STREET
CALCUTTA-700 006
PHONE NO. 35-0926 (Office)

D. O. No PR/88/26

Date 15.11.1988

Dear Dr. Mukherjee,

I am glad to know that Acharya Brojendra Nath Seal College, Cooch Behar, named after the illustrious son of Bengal, celebrates its centenary in the month of December next. Originally named after queen Victoria and founded in 1888 by the Maharaja of Cooch Behar, the College became famous as a centre of learning in the whole of North-Eastern region of the Country under the Acharya and earned the distinction as a premier institution of the region.

I wish the centenary celebration Committee all success in its endeavour and hope that it will rekindle the spirit of enlightenment once again, the need for which is so keenly felt today.

Yours sincerely,
S/d-
Anil Kumar Basak
President

Dr. Jiban Kumar Mukherjee
General Secretary
CENTENARY CELEBRATION COMMITTEE
Acharya Brojendra Nath Seal College
Cooch Behar, West Bengal.

Prof. Ranju Gopal Mukerjee
President

SEAL

PHONE : 29-8595

WEST BENGAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION
CALCUTTA-16

D. O. No 126/Pres/88
November 7, 1988

Dear Prof. Mukherjee,

Thank you for your letter dated 15-10-1988.

I feel greatly honoured to be associated somehow with the Centenary Celebration of this famous seat of learning. The occasion marks the conclusion of a hundred years of struggle and a hundred years of glorious achievements. On this happy occasion, I pay my respect to those known and unknown soldiers who brought this glory to the Institution. I believe that the Institution will be true to its tradition in the coming years and celebrate many more Centenaries in ever brighter glory.

I send my best wishes for the success of the Celebration and congratulate everyone associated with it.

Thanking you once again,

Yours sincerely,
Sd-
(R. G. Mukerjee)
7.11.88

Dr. Jiban Kumar Mukherjee,
General Secretary,
Centenary Celebration Committee.
Acharya Brojendra Nath Seal College,
(formerly Victoria College)
P. O. & Dist. Cooch Behar,

আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল (পূর্বতন ভিক্টোরিয়া) কলেজ, কোচবিহার
শতবর্ষ উদ্‌যাপন কমিটি—১৯৮৮-৮৯

পৃষ্ঠপোষক প্রধান—অধ্যাপক সৈয়দ নুরুল হাসান, মাননীয় রাজ্যপাল, পঃ বঙ্গ

পৃষ্ঠপোষক মণ্ডলী ঃ

শ্রীজ্যোতি বসু,	মুখ্যমন্ত্রী, পঃ বঙ্গ সরকার
ডঃ অসীম দাশগুপ্ত,	অর্থমন্ত্রী, পঃ বঙ্গ ,,
শ্রী কান্তি বিশ্বাস,	শিক্ষামন্ত্রী ,, ,,
,, সরল দেব,	গ্রন্থাগারমন্ত্রী ,, ,,
,, সুভাষ চক্রবর্তী,	ক্রীড়ামন্ত্রী, ,, ,,
,, কমল কান্তি গুহ,	কৃষিমন্ত্রী ,, ,,
,, দীনেশ চন্দ্র ডাকুয়া,	তপঃ জাতি ও আদিবাসী কল্যাণ দপ্তর এবং ঝাড়গ্রাম সংক্রান্ত বিষয়ক মন্ত্রী, পঃ বঙ্গ
,, অমর রায় প্রধান,	লোকসভা সদস্য
,, মানিক সান্যাল,	,, ,,
,, পিযূষ তিরকি,	,, ,,
,, শিবেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী,	বিধায়ক
শ্রীমতি অপরাজিতা গোপ্পী,	,,
শ্রী বিমল বসু,	,,
,, দীপক সেনগুপ্ত,	,,
,, সদাকান্ত রায়,	,,
,, সুধীর প্রামাণিক	,,
,, মনীন্দ্র নাথ বর্মা,	,,
,, বীরেন্দ্র চন্দ্র দে সরকার,	
,, ধীরেন সরকার,	
,, প্রসেনজিৎ বর্মণ,	

উপাচার্য, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়,

,, যাদবপুর ,,
,, রবীন্দ্রভারতী ,,
,, বিদ্যাসাগর ,,
,, বর্ধমান ,,
,, উত্তরবঙ্গ ,,
,, বিধানচন্দ্র কৃষি ,,
,, বিশ্বভারতী ,,

শ্রী এন. চ্যাটার্জী, এম. ডি. উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থা।

সভাধিপতি, জিলা পরিষদ, কোচবিহার। আরক্ষাধক্ষ্য, কোচবিহার।

জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারীক, কোচবিহার। নির্বাহী বাস্তুকার, পূর্ত বিভাগ, কোচবিহার।

আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল (পূর্ব্বতন ভিক্টোরিয়া) কলেজ, কোচবিহার।

শতবর্ষ উদ্‌যাপন কমিটি—১৯৮৮-৮৯

(কার্যকরী কমিটি)

শ্রী এ, এস, লাম্বা, জেলা সমাহর্তা, কোচবিহার—সভাপতি
„ অমিয় ভূষণ মজুমদার—সহঃ সভাপতি
„ নীরোজ বিশ্বাস — „
„ তুষার রায় — „
„ প্রদীপ নাথ — „
„ দীপক গোস্বামী, পৌরপতি, কোচবিহার পৌরসভা—সহঃ সভাপতি
ডঃ দিগ্বিজয় দে সরকার—সহঃ সভাপতি
শ্রী শেখর সরকার — „
„ চিন্ময় দত্ত — „
„ তরুণ লাহিড়ী — „
„ সত্যেন মজুমদার — „
ডঃ জীবন কুমার মুখোপাধ্যায়, ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, এ, বি, এন, শীল কলেজ—সাধারণ সম্পাদক
অধ্যাপক অমিতাভ ঘোড়ুই অধ্যাপক সংসদ (সম্পাদক)
শ্রী সমরেন্দ্র নাথ সাহা—যুগ্ম-সম্পাদক
„ মনোজ রায় — „
„ গৌরগোপাল সাহা— „
„ সমরজিৎ সাহা, (সাধারণ সম্পাদক, ছাত্র-ছাত্রী সংসদ, '৮৮ এ,বি,এন,শীল কলেজ)—যুঃ সঃ
„ দীপেন চন্দ—কোষাধ্যক্ষ

সদস্য

অধ্যাপক স্বপন কুমার চৌধুরী
„ প্রশান্ত কুমার ভৌমিক
„ অমর সাহা
শ্রীমতী বাণী সেন
শ্রী অরুণ ভট্টাচার্য
„ রজত বরণ রায়
„ জগৎরঞ্জন ভট্টাচার্য
শ্রী দীপংকর দাসগুপ্ত
„ তরুণ হোড়
„ রবীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
„ সুবোধ তালুকদার
„ মৃণাল চৌধুরী
„ জীতেন দাস
„ অমিতেষ দত্ত রায়

আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল (পূর্বতন ভিক্টোরিয়া) কলেজ কোচবিহার।

শতবর্ষ উদ্‌যাপন কমিটি—১৯৮৮-৮৯

সদস্য

শ্রী দ্বিজেন দেবনাথ
ডঃ মৃত্যুঞ্জয় সরকার
শ্রী নরেন দত্ত
„ কল্যাণ সোম
„ দ্বীপায়ন ভট্টাচার্য
„ সাগর সাহা
„ বিদ্যুৎ দে
„ অরিন্দম চক্রবর্তী
শ্রীমতী পিয়ালী বসু
শ্রী অমল ভট্টাচার্য
„ পার্থপ্রতিম সেনগুপ্ত
„ দেবাশীষ রায়

শতবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে গঠিত কলকাতা ক্যাম্প কমিটি

গত ১০. ১. ৮৯ তাং গঠিত

শ্রী কমল কান্তি গুহ—সভাপতি
" দীনেশ চন্দ্র ডাকুয়া—সহ সভাপতি
" শিবেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী—ঐ
" অরুণ দাসগুপ্ত—আহ্বায়ক
" ভবরঞ্জন ভৌমিক—দপ্তর সম্পাদক
" সুখবিলাশ বর্মা —সদস্য
" চঞ্চল বিশ্বাস — "
" রুন্টু গুহ নিয়োগী — „
" মৃণাল গুহ রায় — "
" প্রবোধ রায় — "
" বিকাশ সরকার — "
ডঃ রহিম খান — "
শ্রী কাজল বিশ্বাস — "
" কামাখ্যা চৌধুরী — "
ডঃ জ্যোর্তিময় দত্ত — "

আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল (পূর্ব্বতন ভিক্টোরিয়া) কলেজ, কোচবিহার।

শতবর্ষ উদ্‌যাপন কমিটি—১৯৮৮-৮৯

(**কার্যকরী কমিটি**)

শ্রী এ,-এস, লাম্বা, জেলা সমাহর্তা, কোচবিহার—সভাপতি
„ অমিয় ভূষণ মজুমদার—সহঃ সভাপতি
„ নীরোজ বিশ্বাস — „
„ তুষার রায় — „
„ প্রদীপ নাথ — „
„ দীপক গোস্বামী, পৌরপতি, কোচবিহার পৌরসভা—সহঃ সভাপতি
ডঃ দিগ্বিজয় দে সরকার—সহঃ সভাপতি
শ্রী শেখর সরকার — „
„ চিন্ময় দত্ত — „
„ তরুণ লাহিড়ী — „
„ সত্যেন মজুমদার — „
ডঃ জীবন কুমার মুখোপাধ্যায়, ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, এ, বি, এন, শীল কলেজ—সাধারণ সম্পাদক
অধ্যাপক অমিতাভ ঘোড়ুই অধ্যাপক সংসদ (সম্পাদক)
শ্রী সমরেন্দ্র নাথ সাহা—যুগ্ম-সম্পাদক
„ মনোজ রায় — „
„ গৌরগোপাল সাহা— „
„ সমরজিৎ সাহা, (সাধারণ সম্পাদক, ছাত্র-ছাত্রী সংসদ, '৮৮ এ,বি,এন,শীল কলেজ)—যুঃ সঃ
„ দীপেন চন্দ—কোষাধ্যক্ষ

সদস্য

অধ্যাপক স্বপন কুমার চৌধুরী
„ প্রশান্ত কুমার ভৌমিক
„ অমর সাহা
শ্রীমতী বাণী সেন
শ্রী অরুণ ভট্টাচার্য
„ রজত বরণ রায়
„ জগৎরঞ্জন ভট্টাচার্য
শ্রী দীপংকর দাসগুপ্ত
„ তরুণ হোড়
„ রবীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
„ সুবোধ তালুকদার
„ মৃণাল চৌধুরী
„ জীতেন দাস
„ অমিতেষ দত্ত রায়

আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল (পূর্বতন ভিক্টোরিয়া) কলেজ কোচবিহার।

শতবর্ষ উদ্‌যাপন কমিটি—১৯৮৮-৮৯

সদস্য

শ্রী দ্বিজেন দেবনাথ
ডঃ মৃত্যুঞ্জয় সরকার
শ্রী নরেন দত্ত
„ কল্যাণ সোম
„ দ্বীপায়ন ভট্টাচার্য
„ সাগর সাহা
„ বিদ্যুৎ দে
„ অরিন্দম চক্রবর্তী
শ্রীমতী পিয়ালী বসু
শ্রী অমল ভট্টাচার্য
„ পার্থপ্রতিম সেনগুপ্ত
„ দেবাশীষ রায়

শতবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে গঠিত কলকাতা ক্যাম্প কমিটি

গত ১০. ১. ৮৯ তাং গঠিত

শ্রী কমল কান্তি গুহ—সভাপতি
” দীনেশ চন্দ্র ডাকুয়া—সহ সভাপতি
” শিবেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী—ঐ
” অরুণ দাসগুপ্ত—আহ্বায়ক
” ভবরঞ্জন ভৌমিক—দপ্তর সম্পাদক
” সুখবিলাশ বর্মা —সদস্য
” চঞ্চল বিশ্বাস — ”
” রুনু গুহ নিয়োগী — ”
” মৃণাল গুহ রায় — ”
” প্রবোধ রায় — ”
” বিকাশ সরকার — ”
ডঃ রহিম খান — ”
শ্রী কাজল বিশ্বাস — ”
” কামাখ্যা চৌধুরী — ”
ডঃ জ্যোর্তিময় দত্ত — ”

আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল (পূর্বতন ভিক্টোরিয়া) কলেজ, কোচবিহার।

শতবর্ষ উদ্‌যাপন কমিটি—১৯৮৮-৮৯

বিভিন্ন উপসমিতি ঃ

॥ **স্মরণিকা উপসমিতি** ॥

অধ্যাপক অরুন কুমার ঘোষ
শ্রী সমরেন্দ্র নাথ সাহা] —যুগ্ম-আহ্বায়ক।

● **সদস্য** ●

সর্ব্বশ্রী ডঃ দিগ্বিজয় দে সরকার, সুবোধ সেন, বিকাশ কান্তি দত্ত চৌধুরী, ডঃ এস্, এন. ঘোষাল, সৌমেন ঘোষ, সনৎ কুমার ঘোষ, বেনু তরফদার, সাগর সাহা, শ্রীমতি কাবেরী দেব ও শুভাশীষ রায়।

॥ **অর্থ উপসমিতি** ॥

ডঃ জীবন কুমার মুখোপাধ্যায়
শ্রী দীপক গোস্বামী] —যুগ্ম-আহ্বায়ক।

● **সদস্য** ●

সর্ব্বশ্রী দীপেন চন্দ, অধ্যাপক প্রশান্ত কুমার ভৌমিক, বিভাস রঞ্জন চৌধুরী, সমরেন্দ্র নাথ সাহা, মনোজ রায়, অমল ভট্টাচার্য, তরুন লাহিড়ী, শ্রীচাঁদ জৈন, গৌরগোপাল সাহা, ডাঃ মৃত্যুঞ্জয় সরকার, রবীন্দ্র কুমার চক্রবর্তী ও নিতাই সরকার।

॥ **উন্নয়ন ও পরিকল্পনা উপসমিতি** ॥

ডঃ জীবন কুমার মুখোপাধ্যায়
শ্রী দীপক গোস্বামী] —যুগ্ম-আহ্বায়ক।

● **সদস্য** ●

অধ্যাপক প্রশান্ত ভৌমিক, অধ্যাপক পান্নালাল সরকার, সর্ব্বশ্রী মনোজ রায়, সমরেন্দ্র নাথ সাহা, সাম্যব্রত রায়, প্রদীপ নাথ, দীপেন চন্দ, নরেন দত্ত, দ্বিজেন দেবনাথ ও কল্যান সোম।

॥ **সাংস্কৃতিক উপসমিতি** ॥

অধ্যাপক শিশির চট্টোপাধ্যায়
শ্রী দীপায়ন ভট্টাচার্য্য] —যুগ্ম-আহ্বায়ক।

সর্ব্বশ্রী জ্যোতিরিন্দ্র ভট্টাচার্য্য, সুনীল দাশগুপ্ত, নীরজ বিশ্বাস, নরেন দত্ত, অরূপ গুহ, দীপক সাহা, শ্রীমতি সোমা দাস, শ্রীমতি মৌসুমী দে সরকার।

॥ স্বেচ্ছাসেবক উপসমিতি ॥

শ্রী অমিতেশ দত্ত রায়
শ্রী দেবাশীষ রায়] যুগ্ম-আহ্বায়ক।

● সদস্য ●

অধ্যাপক অমিতাভ ঘোড়ুই, অধ্যাপক কমল কুমার চক্রবর্তী, সর্ব্বশ্রী তারিণী রায়, অরুণ করঞ্জাই, ভবানী দাস, শ্রীমতি রুমা গোস্বামী, শ্রীমতি টিংকু ব্রহ্ম,পার্থপ্রতীম সেনগুপ্ত ও রতন চক্রবর্তী।

॥ প্রচার উপসমিতি ॥

অধ্যাপক অমর চন্দ্র সাহা
শ্রী সাগর সাহা] —যুগ্ম-আহ্বায়ক।

● সদস্য ●

অধ্যাপক স্বপন কুমার চৌধুরী, সর্ব্বশ্রী অমিতেশ দত্ত রায়, চিন্ত সেন, সৌরেন সাহা, বিপুল ভট্টাচার্য, বাবু পম বর্মন ও রঞ্জিৎ সূত্রধর।

॥ দপ্তর, যোগাযোগ ও অভ্যর্থনা উপসমিতি ॥

অধ্যাপক শচীন্দ্র নাথ সাহা
শ্রী সুবোধ তালুকদার] —যুগ্ম-আহ্বায়ক।

সর্ব্বশ্রী কমলা প্রসন্ন চক্রবর্তী, তুষার রায়, স্নিগ্ধ সোম চৌধুরী, অধ্যাপক গণেশ বসাক, দীনেশ পাল, তাপস সরকার ও বিভাস দাস।

॥ আবাসন উপসমিতি ॥

অধ্যাপক স্বপন কুমার চৌধুরী
শ্রী হরেন্দ্র সাহা] যুগ্ম-আহ্বায়ক।

অধ্যাপক কালীপদ গিরি, সর্ব্বশ্রী বিমল কুমার বসু, তপন মুখার্জী, এন, সি. চ্যাটার্জী, মৃণাল কান্তি চৌধুরী, সুবল সরকার, তপন সাহা ও জহর দেব।

॥ পরিবহণ উপসমিতি ॥

শ্রী বিমল কুমার বসু
,, চিত্ত লাহিড়ী] —যুগ্ম আহ্বায়ক।

সর্বশ্রী স্বরাজ সোম, তুষার গুহ ঠাকুরতা, আবীর অধিকারী, জীতেন সরকার, আসানুল করিম, সুভাষ রায় সরকার ও বিদ্যুৎ সাহা।

॥ পুনর্মিলন উৎসব উপসমিতি ॥

অধ্যাপক সমীরেন্দ্র নাথ রায়
শ্রী বিদ্যুৎ দে] —যুগ্ম-আহ্বায়ক।

সর্বশ্রী অমিয় ভূষণ মজুমদার, চারু চন্দ্র রায়, অধ্যাপক গুরুপদ দেব, অধ্যাপক প্রবীর বসাক, অরুণ ভট্টাচার্য, অরিন্দম চক্রবর্তী ও কানাই দাস।

॥ প্রদর্শনী উপসমিতি ॥

অধ্যাপক প্রশান্ত কুমার ভৌমিক
শ্রী তাপস বরণ চন্দ — যুগ্ম-আহ্বায়ক।

অধ্যাপক প্রবীর বসাক, অধ্যাপক অশোক পাল, সর্বশ্রী নরেন দত্ত, রজত বরণ রায়, স্নিগ্ধ সোম চৌধুরী, অতনু বিশ্বাস ও অপূর্ব ভট্টাচার্য্য।

॥ আপ্যায়ন উপসমিতি ॥

অধ্যাপক নারায়ণ সাহা
শ্রীমতি দীপা চক্রবর্তী — যুগ্ম-আহ্বায়ক।

সর্বশ্রী দীনেশ পাল, অধ্যাপক ভবতোষ ঘোষ, শচীন বর্মন, শক্তিব্রত রায়, বকুল দত্ত, অম্লান জ্যোতি মজুমদার, তুষার গুহ নিয়োগী, পরিমল গুহ চৌধুরী, শ্রীমতী মহাশ্বেতা রায় ও বিদ্যুৎ পাল।

॥ মঞ্চ ও মণ্ডপ সজ্জা উপসমিতি ॥

অধ্যাপক পীযূষ তালুকদার
শ্রী নরেন দত্ত — যুগ্ম-আহ্বায়ক।

সর্বশ্রী সাম্যব্রত রায়, অধ্যাপক সরোজ সান্যাল, দেবাশীষ রায়, রজত গুহ মজুমদার, রণজিৎ পাল, প্রলয় দত্ত, অপ্রতীম দে ও শুভাশীষ মালাকার।

॥ ক্রীড়া উপসমিতি ॥

শ্রী জগৎ রঞ্জন ভট্টাচার্য্য
শ্রীমতি বাণী সেন — যুগ্ম-আহ্বায়ক।

সর্বশ্রী সতীশ চন্দ, হরিদাস বণিক, অশোক মহাপাত্র, তরুন হোড়, দয়ানিধি অধিকারী, গৌতম সরকার, শ্রীমতি মহামায়া রায়, দীপঙ্কর দাশগুপ্ত ও ইসমেতোরা আলী।

॥ বিদ্যুৎ ও আলো উপসমিতি ॥

অধ্যাপক নিমাই সাহা
শ্রী শান্তনু সাহা — যুগ্ম-আহ্বায়ক।

অধ্যাপক বেণী মাধব মাহাতো, সর্বশ্রী কানাই দাস, রমেশ ঝাঁ, মতিয়ার রহমান ও দিলীপ সাহা।

॥ সেমিনার উপসমিতি ॥

অধ্যাপক সুভাষ ভট্টাচার্য্য
ডঃ দিগ্বিজয় দে সরকার — যুগ্ম-আহ্বায়ক।

অধ্যাপক মধুসূদন সাহা, শ্রীমতিমঞ্জুশ্রী সেনগুপ্ত; অধ্যাপক কৃষ্ণেন্দু দে, অধ্যাপক শেখর সরকার, ডঃ এস্ এন. ঘোষাল, মনমোহন সেন, জ্যোতিরিন্দ্র ভট্টাচার্য্য বিদ্যুৎ দে ও দিপেন রায়।

বর্তমানে যারা কলেজে কর্মরত

ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ঃ শ্রী জীবন কুমার মুখোপাধ্যায়

ঃ অধ্যাপকবৃন্দ ঃ

বাংলা
শ্রী অরুণ কুমার ঘোষ
" জ্ঞানেন্দ্রনাথ মন্ডল
" অনন্ত কুমার সাহা
" স্বপন কুমার দে

ইংরাজী
শ্রী ননীগোপাল চক্রবর্ত্তী
" দেবব্রত চট্টোপাধ্যায়
" পার্থপ্রতিম রায়
শ্রীমতী অনুশীলা হাজরা
শ্রী শিশির কুমার চট্টোপাধ্যায়
" নির্মলেন্দু দেব (আংশিক সময়ের জন্য)

সংস্কৃত
শ্রী কালিপদ গিরি
" ভবতোষ ঘোষ

দর্শন
শ্রী মধুসূদন মৈত্র
" বিধুরঞ্জন নাথ
" সরোজনাথ সান্যাল
" নিশীথ কমল কর্ম্মকার (আংশিক সময়ের জন্য)
" হীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ঐ

অর্থনীতি
শ্রী অলকনাথ রায়
" রসময় জানা
" পান্নালাল সরকার
শ্রী বিমল কুমার সাহা
" অনিল ভুইমালি (আংশিক সময়ের জন্য)

রাষ্ট্রবিজ্ঞান
শ্রী রেবতীরমন মুখোপাধ্যায়
" কমল কুমার চক্রবর্ত্তী
" বিভাস চৌধুরী
" দেবানন্দ সেনগুপ্ত
" আশিষ কুমার বসু

ইতিহাস
শ্রী নারায়ণ চন্দ্র সাহা
শ্রীমতী শুভলক্ষী পান্ডে
" রত্না সেনগুপ্ত
শ্রী প্রবীর আচার্য (আংশিক সময়ের জন্য)

পদার্থবিদ্যা
শ্রী সমীরেন্দ্রনাথ রায়
" মধুসূদন সাহা
" সুভাষচন্দ্র কর
" অচিন্ত্য বন্দ্যোপাধ্যায়
" অমর চন্দ্র সাহা
" অমিতাভ ঘোড়ুই
" কুমারেশ চক্রবর্ত্তী
" গনেশচন্দ্র বসাক
" সন্তোষ কুমার পাল
" অশোক কুমার পাল
" আশিস রঞ্জন জানা (আংশিক সময়ের জন্য)
শ্রীমতী সুনন্দা সরকার ঐ

রসায়ন

শ্রী শচীন্দ্রনাথ সাহা
" প্রশান্ত কুমার ভৌমিক
" শরদিন্দু ভট্টাচার্য
" হরিগোপাল মিত্র মুস্তাফি
" পীযূষ তরফদার
" সুভাষচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
" আনোয়ারুল মোল্লা
" বেনীমাধব মাহাতো
" যতীন্দ্র কুমার সরকার
" সন্তোষ কুমার ধর
" বরুণ কুমার দত্ত

শ্রী দিলীপ কুমার পাল (আংশিক সময়ের জন্য)
" প্রশান্ত সরকার ঐ

প্রাণীবিদ্যা

শ্রী প্রবীর কুমার বসাক
" নিমাইচন্দ্র সাহা
" সত্যসুন্দর বর্মন

উদ্ভিদবিদ্যা

" শ্রী মানসরঞ্জন মজুমদার

শারীর শিক্ষা

শ্রীমতী বানী সেন
শ্রী হরিদাস বণিক
" অশোক মহাপাত্র

—ঃ অন্যান্য ঃ—

গ্রন্থাগার

শ্রী দীপেন চন্দ
শ্রীমতী মঞ্জু সেনগুপ্ত

অফিস

শ্রী সুবোধ তালুকদার
" নিতাইচন্দ্র সরকার
" সুবল সরকার
" তাপস কুমার মুন্সী
" দেবদাস পাল
" লক্ষণ মাহাতো
" জীতেন্দ্রনাথ দাস
" রণজিৎ সূত্রধর
শ্রীমতী সুবলা কার্জি
শ্রী কমলা হরিজন
শ্রীমতী বুলা ঝাঁ
শ্রী মোহনবাঁশি সরকার

শ্রী শম্ভুনাথ বিশ্বাস
শ্রীমতী হেনা দে
শ্রী অজিত সূত্রধর

বিভাগীয় সহায়তায়

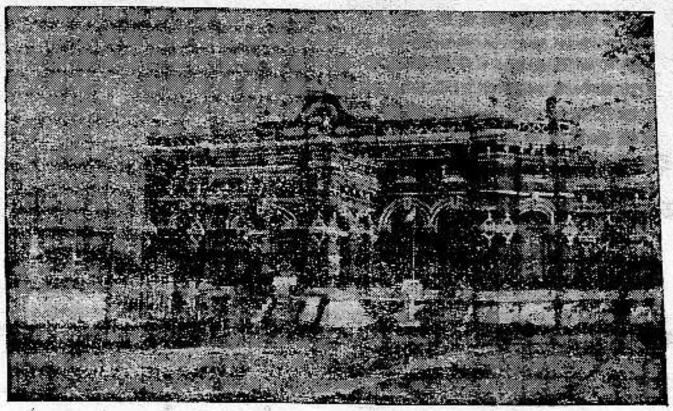
শ্রী ফনীন্দ্রনাথ চৌধুরী
" দিনেন্দ্র কুমার দত্ত
" সুধীরচন্দ্র সাহা
" অনিল চন্দ্র পাল
" মনোরঞ্জন দাস
" শশিকান্ত পাল
" সুধাংশু কুমার পাল
" মুকুলকান্তি দে
" মোশারফ হোসেন
" সর্বানন্দ রায়
" অলক শীল
" রমেশ ঝাঁ

শ্রী অনন্ত কুমার দে
শ্রীমতী প্রমীলা বর্মন
শ্রী তরুণ কুমার দে

আবাসন সহায়তায়

শ্রী রাসবিহারী মাহাতো
" মহেশ্বর রায়
শ্রীমতী মীরা দাস
" নীলিমা ভট্টাচার্য্য
" নিভা সিংহ
শ্রী রামসেবক পান্ডে
" পরশুরাম রায়
" বীরেন্দ্রনাথ সরকার

শ্রীমতী তারা হরিজন
শ্রী হরদেও শর্মা
" অবোধ কুমার মন্ডল
" পবিত্র কুমার মাহাতো
" প্রভাত হরিজন
" রামকরণ মাহাতো
" টুনটুন ঝা
শ্রীমতী সাবিত্রী নিয়োগী (আংশিক সময়ের জন্য)
ডঃ পি, সি সেন ঐ
ডঃ বি, চক্রবর্ত্তী ঐ
ত্রিনাথ বিশ্বাস ঐ

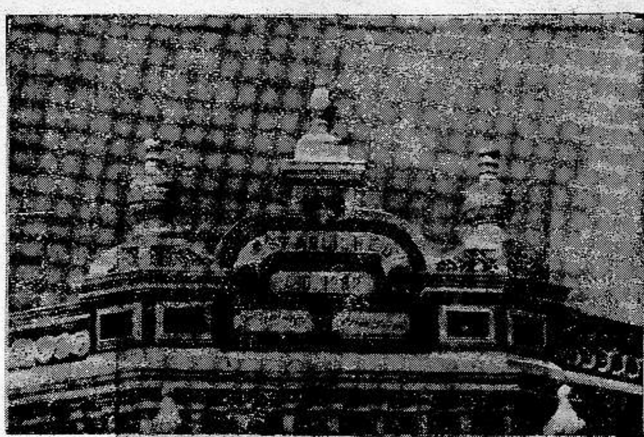


আচার্য ব্রজেন্দ্র নাথ শীলের আবক্ষমূর্ত্তি এবং মহাবিদ্যালয়ের প্রাচীন ভবন।

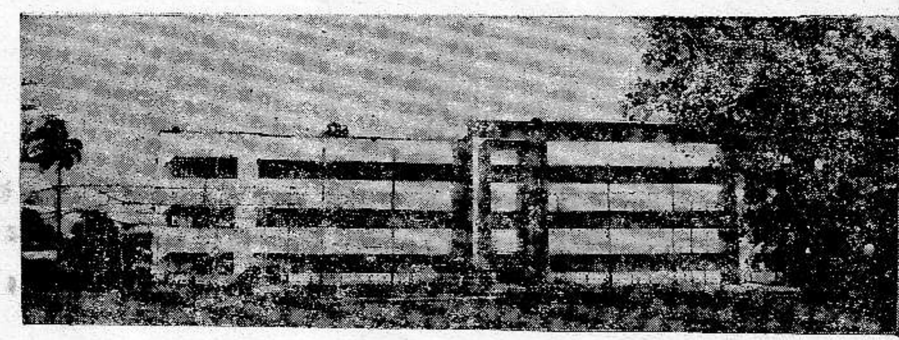


মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণ।

ছবি : সাগর সাহা।

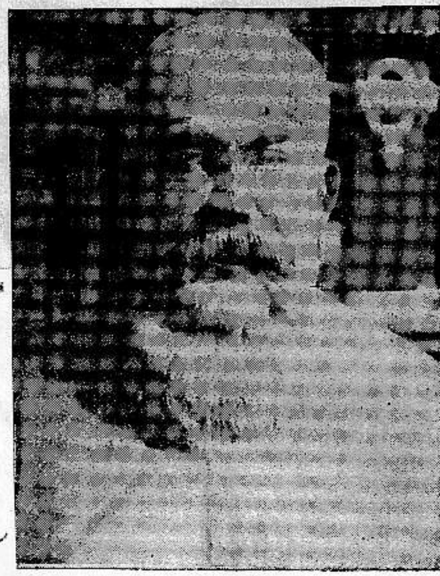


মহাবিদ্যালয়ের প্রাচীন ভবনের সম্মুখভাগ।



শতবার্ষিকী ভবন।

ছবি : সাগর সাহা।



আচার্য ব্রজেন্দ্র নাথ শীল ।

শ্রদ্ধার্ঘ্য

শতবর্ষের কালচক্রে দেশে বিদেশে যে সব মহতী আত্মা সত্য, সুন্দর ও শান্তির জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন; সেই সব শিল্পী, সাহিত্যিক, দেশপ্রেমী, সমাজ সংস্কারক— যাঁদের জীবন আমাদের ঐশ্বর্য, যাঁদের কর্ম আমাদের পাথেয়, মৃত্যু যাঁদের অমর করেছে— তাঁদের সকলের উদ্দেশ্যে জানাই বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলী ।

সম্পাদকীয়

একশ বছরের গৌরবের আলোকে দেদীপ্যমান কোচবিহারের শিক্ষাজগতের ঐতিহ্যবাহী আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল (ভিক্টোরিয়া) কলেজের শতবর্ষপূর্ত্তি উৎসব অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ৪ ঠা মার্চ থেকে ৯ই মার্চ পর্যন্ত। সুদীর্ঘ একশ বছরের কালবলয়ে এই কলেজের আঙ্গিনায় যেমন বহুমনীষার স্ফুরণ ঘটেছে, তেমনি এর শতবর্ষ পূর্তি উৎসবকে সফল করে তুলবার জন্য এগিয়ে এসেছেন প্রাক্তন ও বর্ত্তমান ছাত্র-ছাত্রীরা, বহু শুভানুধ্যায়ী ব্যাক্তি, বহু প্রতিষ্ঠান। তাঁদের ঐকান্তিক সহযোগিতার প্রোজ্জ্বল স্মরণ- চিহ্ন হল এই "স্মরণিকা",। স্বল্প সময়ের মধ্যে এই স্মরণিকার মুদ্রিত রূপ প্রকাশ করতে হয়েছে বলে এতে অনিচ্ছাকৃত বহু ত্রুটি থেকে গেছে। এই ত্রুটির জন্য আমরা দুঃখ প্রকাশ করছি।

আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল (ভিক্টোরিয়া) কলেজের শতবর্ষ পূর্ত্তি উৎসবের আঙ্গিনায় সমবেত সুধীমণ্ডলীকে জানাই অভিনন্দন এবং যাঁদের হার্দ্য সহযোগিতায় এই স্মরণিকা আলোর মুখ দেখতে পেল তাঁদের জানাই কৃতজ্ঞতা।

অধ্যাপক শ্রী অরুণ কুমার ঘোষ।
শ্রী সমরেন্দ্র নাথ সাহা।

● উৎসব ছাড়িয়ে ●

অরুণ কুমার ঘোষ

ভিক্টোরিয়া কলেজ নামে একদা খ্যাত, আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের পূত নামে অধুনা চিহ্নিত, আমাদের এই বিদ্যায়তনের শতবর্ষ পূর্তি এক নিঃসংশয়ে গৌরবোজ্জ্বল ঘটনা। যখন ভাবি আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের মতো বহুধাবিস্তৃত জ্ঞানরাজ্যের অধিপতি বেশ কয়েক বছর এই বিদ্যায়তনের সঙ্গে অধ্যক্ষতাকর্মের সূত্রে জড়িত ছিলেন নিবিড়ভাবে এবং তাঁর ইংরেজী ভাষায় সমালোচনামূলক নূতন প্রবন্ধাবলী তথা বাংলা সাহিত্যে নব্য রোমান্টিকতার ভাষ্য রচনা এখানেই নিষ্পন্ন হয়েছিল, তখন স্বভাবতই রোমাঞ্চিত হয়ে উঠি। আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথের পদাঙ্ক অনুসরণে বেশ কিছুকাল আমাদের এই বিদ্যায়তনে যে শিক্ষা-সংস্কৃতির ভাবগম্ভীর আবহ জাগরূক ছিল, প্রসারিত ছিল চিন্তা-কল্পনার মহতী লালনক্ষেত্র, তার কিছু আভাস, কিছু সুবাস, কিছু স্পর্শ সঞ্চিত হয়ে রইল আমাদের এই "স্মরণিকা"-য় গেঁথে তোলা কতিপয় স্মৃতিকথনে। প্রাথমিক পরিকল্পনামতো এই স্মরণিকা যে সম্পূর্ণ এবং ঋদ্ধ হয়ে উঠতে পারল না, সে অচরিতার্থতার গ্লানিভার বহনে আমি অকুণ্ঠিত। তবে সময়ের আত্যন্তিক স্বল্পতার সঙ্গে সুষ্ঠু সংযোগ ও সমন্বয়ের অভাব যুক্ত হয়ে আমাদের আরব্ধ কর্মকে খুবই কষ্টসাধ্য করে তুলেছিল। কিছু কিছু শূন্যতা ও বিচ্যুতি আমাকে খুবই পীড়া দিচ্ছে। অমিয়ভূষণ মজুমদারের মতো অসামান্য কথাশিল্পী আমাদের এই শহরেই থাকেন, অথচ আমরা বঞ্চিত হলাম তাঁর রচনা মুদ্রণের সৌভাগ্য থেকে। বেশ কিছু মুদ্রণপ্রমাদ রয়ে গেল, বিশেষ করে শ্রীদুর্গাকিংকর ভট্টাচার্যের লেখা "কোচবিহারে আমার কর্মচ্যুতির প্রেক্ষাপট ঃ গণ-আন্দোলন ও ফলশ্রুতি" শীর্ষক উচ্চনাদী ও তীব্রস্বাদী রচনাটিতে যে একটি নিদারুণ তথ্যগত ভ্রান্তি রয়ে গেল, ১৯৪৫-এর ঘটনা উল্লিখিত হল ১৯৪৬-এর ঘটনা বলে তা খুবই পরিতাপজনক। সমগ্র প্রকাশনটিতে যে সামগ্রিক সৌষ্ঠব ও সৌষম্যের প্রকাশ আমার প্রধান অন্বিষ্ট ছিল, তাও অনায়ত্ত রয়ে গেল। যাই হোক এ ধরণের আক্ষেপ বোধ হয় এখন নিরর্থক। অন্ততঃ একথা নিশ্চয়ই অনৃতভাষণ হবে না যদি বলি, এই 'স্মরণিকা'-র কয়েকটি লেখায় যে দূর অতীতের স্মৃতি-রোমন্থন আধারিত, তা শুধুই সুখোষ্ণ নস্টালজিয়ার মৌতাত উপভোগ নয়, তার একটি বৃহত্তর সার্থকতাও রয়েছে। অতীতের মুকুরে সুপষ্ট-রূপে বিম্বিত হয়ে উঠবে আমাদের এই বিদ্যায়তনের বর্তমান অবস্থা ও পরিস্থিতির বাস্তব চিত্র এবং সে সম্পর্কে সজাগ ও সচেতন হলে অবশ্যই সব আলো, হাসি, গান, মুখরতা ছাড়িয়ে নির্মোহ কঠোর আত্ম-সমীক্ষার একান্ত প্রয়োজনীয় কৃত্যটুকু সম্পন্ন হবে। আর তখন এই অত্যন্ত ঋজু, সরল, অথচ ভয়ঙ্কর অস্বস্তিকর প্রশ্নের মুখোমুখি আমরা দাঁড়াব যে, এই কলেজের শ্রেণীকক্ষগুলিতে শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে প্রার্থিত

আদানপ্রদানের উপযুক্ত পরিবেশ এখনও কতটা অক্ষুন্ন রয়েছে ? বাঁধা বুলির উদ্গার নয়, ছকবাঁধা চিন্তার রোমন্থন নয়, পাঠ্যতালিকার ক্লিশে-ধূসর চংক্রমণ নয়, শিক্ষার্থীর স্বাধীন চিন্তা ও ভাবনাকে উস্‌কে দেওয়ার মতো, মনের সবকটা জানালা খুলে দিয়ে কল্পনার দখিণা বায়ুর অবাধ গতায়াত নিশ্চিত করার মতো যে প্রকৃত তাৎপর্যবহ শিক্ষা, তার উপযুক্ত পরিমণ্ডল এখনও কতটুকু রয়েছে আমাদের এই বিদ্যায়তনে ? এই প্রশ্ন আমরা এড়িয়ে যেতে পারব না, এড়িয়ে যাবও না, কারণ যত স্বচ্ছ বিবেক নিয়ে আমরা এর সম্মুখীন হব, ততই আমাদের ভবিষ্যৎ যাত্রাপথ সুচিহ্নিত হয়ে উঠবে।

কোচবিহার—রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ছাত্র সমাজ ও জনগণের প্রথম অভ্যুত্থান

বীরেন্দ্র চন্দ্র দে সরকার
(প্রাক্তন ছাত্র)

১৯৪৬ সাল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষ পর্যায়। জাপানে হিরোসীমা নাগাসাকিতে অ্যাটম বোমার বিস্ফোরণে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ তার দম্ভের প্রকাশ ঘটায়। ভারতে এই সময় ব্রিটিশ অধীনতার বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রাম ক্রমশঃ তুঙ্গে উঠছে। যারা ভারতের এই লড়াই এর সময় কোচবিহারের মানুষ রাজতন্ত্রের নাগপাশের বন্ধনে পড়ে আছে। এরাজ্যে কোন রাজনৈতিক আলোচনা নিষিদ্ধ—এমনকি ঘরবাড়ী তৈরী করার ক্ষেত্রে দোতলা করার উপরও নিষেধাজ্ঞা ছিল। এক কথায় পরিপূর্ণ স্বেচ্ছাচারী সামন্ততান্ত্রিক রাজতন্ত্র বিদ্যমান। যে কোনো সময়ে রাজা যে কোন প্রজার জমি গ্রাস করে চলেছে। প্রজাদের সম্পত্তি বা জীবনের কোন অধিকার ছিল না। এর বিরুদ্ধে সামান্যতম প্রতিবাদ বা অনুযোগও রাজদরবার বরদাস্ত করত না। প্রতিবাদ হলে সঙ্গে সঙ্গে রাজদ্রোহী ঘোষণা করে কোচবিহার ত্যাগের ২৪ ঘন্টার নোটীশ দেওয়া হত। এরই পরিপ্রেক্ষিতে কোচবিহারে ছাত্রদের এক গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালন করতে দেখা গেছে। তা হল—১৯৪৫ সালের ২১শে আগস্ট, রাজতন্ত্রের পাহাড়াদার মিলিটারী-ইনফ্যান্টির বিরুদ্ধে ছাত্র সহ সমস্ত জনগণের বিক্ষোভ ও গণ জাগরণ। কোচবিহারের ইতিহাসে রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে এই প্রথম বিক্ষোভে ফেটে পড়ে—যা ব্যক্তি স্বাধীনতার আন্দোলনে পর্যবসিত হয়।

ঘটনার সূত্রপাত এরকম—ভিক্টোরিয়া (এ, বি, এন, শীল) কলেজ হোস্টেলের সামনের রাস্তায় দু'জন মিলিটারী একই সাইকেলে চড়ে যাবার সময় একজন প্রৌঢ় পথচারীকে ধাক্কা দেয়। আহত পথচারীকে হাসপাতালে পাঠানোর পরিবর্তে ঐ দু'জন মিলিটারী তাদের যাত্রায় বাঁধা হওয়ার অজুহাতে আহত ঐ ব্যক্তিকে প্রচন্ডভাবে প্রহার করতে শুরু করে। এই অমানুষিক প্রহারে তাঁর অন্ডকোষ কেটে যায়। পৈশাচিক এই অত্যাচারের সাক্ষী হোস্টেলের সমস্ত আবাসিক ছাত্ররা। তারা সাথে সাথে এই দুই অপরাধী মিলিটারীকে ধরে পুলিশ লাইনের জমা দেয় (যদিও তাদেরকে কোতোয়ালী থানার জমা দিলেই সঠিক হ'ত)। এই দুই মিলিটারী পুলিশ লাইন থেকে ছাড়া পেয়ে তাদের হেড কোয়ার্টার্সে গিয়ে ছাত্রদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলে, মিলিটারী কর্তৃপক্ষের মধ্যে তাদের অফিসার কুমার পূর্ণেন্দু নারায়ণ ও দীনেশ চন্দ্র চন্দ মিলিটারীদের মধ্যে ছাত্র বিরোধী উত্তেজনা সৃষ্টি করে কলেজে এবং হোস্টেলে রুটমার্চ করায়। বেলা তখন প্রায় ৪টা। হঠাৎ দু'দিক থেকে কলেজ ও হোস্টেল মিলিটারী দ্বারা আক্রান্ত হতে দেখে হতবাক্ ছাত্র ছাত্রীরা ক্লাস ছেড়ে

অধ্যক্ষের ঘরে আশ্রয় গ্রহণ করে।

ইতিমধ্যে মিলিটারীরা এক রিক্সা চালকের টিকি কেটে দেয় এবং রিক্সা ভাঙচুর করে। শুধু তাই নয় উন্মত্ত মিলিটারীরা অধ্যক্ষ শ্রদ্ধেয় শ্রী ভোলা ধরের উপরও চড়াও হলে অধ্যাপক শ্রী দুর্গা কিংকর ভট্টাচার্য্য, শ্রী ক্ষিরোদ সান্যাল সহ অন্যান্য অধ্যাপকগণও বাধা দেন এবং অধ্যক্ষকে বাঁচাতে সক্ষম হলেও নিজেরা অল্প বিস্তর আহত হন। এর পরেই মিলিটারীরা কলেজের ভিতর দিক থেকে হোস্টেল অভিমুখে ধাওয়া করে। হোস্টেলের মূল গেট দিয়ে ঢুকে আর একদল মিলিটারী ছাত্রদের উপর এলোপাথারী মারপিট শুরু করে। একজন ছাত্রকে দোতলা থেকে লাথি মারতে মারতে সিঁড়ি দিয়ে নীচে ফেলে দেয়। অন্য আর একজন ছাত্র বাঁচার জন্য ঘরের দরজা বন্ধ করেছিল। দরজা ও কাঁচের জানালা ভেঙ্গে তার ঘরে ঢুকে মিলিটারীরা ঘরের ভেতর ভাঙ্গা কাঁচ বিছিয়ে তাঁকে খালি গায়ে কাঁচের ওপর শুইয়ে দিয়ে অত্যাচার করতে থাকে এবং ক্ষত বিক্ষত সেই ছাত্রটিকে জানালা দিয়ে গলিয়ে দোতলা থেকে নীচে ফেলে দেয়। নীচে ঘাস থাকায় সে প্রাণে বেঁচে যায়। যখন আহত ছাত্রটি উঠে পালাতে চেষ্টা করে তখন উপর থেকে তাঁকে জলের কুঁজো ছুড়ে মারে।

আর একদল মিলিটারী রাস্তায় তিনজন ছাত্রকে পেয়ে লাঠিপেটা করে মাথা ফাটিয়ে দেয়। এ ঘটনাটি ঘটে কলেজ থেকে একটু দূরে জেনকিন্স স্কুলের সামনে। এভাবেই মিলিটারীদের বর্বর অত্যাচারের ফলে ২৬ জন ছাত্র আহত অবস্থায় হাসপাতালে স্থানান্তরিত হয়। এদের মধ্যে ছয় জনের অবস্থা বেশ গুরুতর ছিল।

এই পৈশাচিক ঘটনার সাক্ষী হাজার হাজার কোচবিহারবাসী। সেই দিন রাতেই এই অমানুষিকতার বিরুদ্ধে অধ্যাপক শ্রী চুনীলাল মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীতে কোচবিহার শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের এক সভা থেকে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়। এই সভার সভাপতি ছিলেন অধ্যাপক শ্রী মুখোপাধ্যায়। পাশাপাশি ছাত্রদের একটি সংগ্রাম কমিটিও গড়ে ওঠে। যার নেতৃত্বে ছিলেন কমরেড্ কানাই বন্দ্যোপাধ্যায় ও কল্যাণ দাস।

এই সমস্ত পৈশাচিক ঘটনার প্রতিবাদে কোচবিহারের জনগণ প্রচন্ড উত্তেজিত হয়ে পড়েন। এই জনরোষকে সংগঠিত করার মূল উদ্যোগ নিয়েছিলেন তৎকালীন বে-আইনী ও গোপন কমিউনিষ্ট পার্টি। কমিউনিস্ট পার্টি ও ছাত্র সংগ্রাম কমিটির ডাকে পরদিন গোটা কোচবিহার শহরে হরতাল ও ধর্মঘট ডাকা হয়। এটাই হচ্ছে কোচবিহারের ইতিহাসে প্রথম সফল হরতাল ও ধর্মঘট। দ্বি-শতাধিক ছাত্র ও জনতার স্কোয়াড সারা শহর জুড়ে প্রতিবাদের স্লোগান তোলেন এবং দাবী করেন –'বর্বর মিলিটারীদের বিচার চাই, শাস্তি চাই।'

এই সকল ধর্মঘটে প্রথম সামিল হন শহরের পৌরসভার সমস্ত হরিজন কর্মীরা। বেলা বাড়ার সাথে সাথে এতে যোগ দেন স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রী এবং অফিস কর্মচারীরা। শহরের সমস্ত দোকান পাটও ঐ দিন ভোর থেকেই বন্ধ থাকে ২৪ ঘন্টার জন্য। ইন্দিরা দেবী স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা শ্রীমতি অশোকা (বেবী) রায়কত ও রাজপরিবারের ঘনিষ্ট ব্যাক্তি হয়েও উমা বসুর (দত্ত) নেতৃত্বে প্রায় ২০০০ ছাত্রীর একটি মিছিল এই ঘটনার প্রতিবাদে শহর পরিক্রমা করে লাইনের

মাঠে ডাকা প্রতিবাদ সভায় যোগ দেয়। ছাত্রদেরও একটি বিশাল মিছিল শহর পরিক্রমা করে ঐ সভায় যোগ দেয়। এই প্রতিবাদ সভায় শহরের প্রতি বাড়ী থেকে মানুষ বাড়ী খালি করে যোগ দেন। প্রায় ২০,০০০ মানুষ-যা তদানীন্তন কালের কোচবিহারের জনসংখ্যার সমান—এই সভায় সামীল হন।

এই ঘটনা ঘটার, সাথে সাথেই গোপন কমিউনিষ্ট পার্টি ও ছাত্র ফেডারেশনের কর্মীরা হাসপাতালে আহতদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন এবং সমস্ত তথ্য নিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে ও ছাত্র ফেডারেশনের প্রাদেশিক কমিটিকে জানান। এই খবর পাঠাতে দু'দিন দেরী হয়, কারণ কোচবিহার পোষ্ট অফিস এ খবর রাজ্যের বাইরে পাঠাতে অস্বীকার করে রাজরোষের ভয়ে। ফলে ছাত্র ফেডারেশনের কর্মীরা আলিপুর দুয়ার থেকে টেলিগ্রাফ ও চিঠি মারফৎ এই খবর তাঁদের প্রাদেশিক অফিসে পাঠান।

এই ঘটনার সময় কোচবিহারের মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্র নারায়ণ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষ দিকে বৃটিশ বাহিনীর সাথে মালয়ে ছিলেন। রাজমাতাও ছিলেন রাজ্যের বাইরে। মিলিটারী অত্যাচারের কথা শুনে রাজমাতা কোচবিহারে এলে নাগরিক কমিটি তাঁর সাথে দেখা করে দোষী মিলিটারীদের প্রকাশ্য বিচার ও শাস্তি দাবী করেন। রাজমাতা মিলিটারীদের অত্যাচারের কথা সরাসরি অস্বীকার করলে নাগরিক কমিটি ও ছাত্র সংগ্রাম কমিটি চ্যালেঞ্জ করে আবার একটি জনসভা ডাকেন এবং সেখানে রাজমাতার উপস্থিতি দাবী করেন। পরদিন আবার বিশাল ছাত্র ও নাগরিক মিছিল শহর পরিক্রমা করে জনসভার আহ্বান জানায়। সমস্ত কোচবিহার ফাঁকা করে নির্দ্ধারিত দিনে আবার ২০.০০০ মানুষের জমায়েত হল লাইনের মাঠে। এই সভায় রাজমাতার প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজার এ, ডি, সি, রাজেণ সিং। এই সভার সভাপতি ছিলেন অধ্যাপক শ্রী চুনীলাল মুখোপাধ্যায় এবং মূল বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক শ্রী দুর্গা কিংকর ভট্টাচার্য প্রমুখ বিশিষ্ট নাগরিক ও ছাত্র নেতৃবৃন্দ।

ছাত্র ফেডারেশনের ডাকে কলকাতা শহরের ওয়েলিংটন অধুনা রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে প্রায় ১৫'০০০ মানুষের এক প্রতিবাদ সভা হয়। এই বর্বর ঘটনার প্রতিবাদে সারা বাংলায় (অবিভক্ত) কোচবিহারের সাধারণ মানুষের সমর্থনে এবং রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভা ও মিছিল চলতে থাকে। পাশাপাশি কলকাতাতে কোচবিহার পিপলস্-অ্যাসোসিয়েশন গড়ে ওঠে। এই অ্যাসোসিয়েশনও কলকাতায় কোচবিহারের রাজতন্ত্রের অত্যাচারের বিরুদ্ধে জনমত গঠনে সমিল হন।

এই পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়ে রাজমাতা অবশেষে দোষী মিলিটারীদের প্রকাশ্য বিচার ব্যবস্থায় রাজী হন। বিচারে কুমার পূর্ণেন্দু নারায়ণ সহ ১০৫ জন দোষী মিলিটারীর জেল হয়। কোচবিহারের ইতিহাসে রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের গণ জাগরণের এক বিরাট সাফল্য অর্জিত হল।

এই বিজয়ের পরই কোচবিহারের মানুষ ব্যক্তি স্বাধীনতা ও অধিকার অর্জন করতে সমর্থ হন। তখন থেকেই কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে ছাত্র সমাজ ও জনগণের বিভিন্ন আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে। এই আন্দোলনগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল আজাদি হিন্দ ফৌজের নেতা জেনারেল শাহ নওয়াজ খানের মুক্তির দাবীতে আন্দোলন, রসিদ আলী

দিবসের আন্দোলন ও কাশ্মীরের তোগচা রাজতন্ত্র বিরোধী সংগ্রামের সমর্থনে আন্দোলন। পাশাপাশি ছাত্র ও জনগণের অন্যান্য অংশে বিভিন্ন সংগঠনগুলি প্রকাশ্যেই তৈরী হতে শুরু হয়।

রাজশক্তি সাময়িকভাবে এই বিচারের মধ্য দিয়ে পিছু হঠলেও, প্রজাদের বিরুদ্ধে তাদের অত্যাচারের অস্ত্র শাণিত করতেই থাকে। এর নজীর হিসেবে আমরা দেখি মাত্র দেড় বছরের মধ্যেই সদ্য গড়ে ওঠা ঐ গণ আন্দোলন ও বে-আইনী কমিউনিস্ট পার্টিকে ধ্বংস করে দেবার জন্য প্রচেষ্টা চালায়। এই সময়েই রামভোলা স্কুলের শিক্ষক সরোজ ভট্টাচার্য ও আমাকে (লেখক) ২৪ ঘন্টার নোটীশে কোচবিহার ত্যাগের নির্দেশ দেয়।

কিছুদিনের মধ্যেই ভারতবর্ষের স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর বে-আইনী কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে একটি ব্যাক্তি স্বাধীনতা কমিটি গঠিত হয়। এর নেতৃত্বে ছিলেন অধ্যাপক দুর্গা কিংকর ভট্টাচার্য্য। ১৯৪৭-এর ১৫ ও ১৬ই আগস্ট দ'ুদিন কোচবিহার রাজ্যের নিয়ম কানুন কিছুটা শিথিল করা হয়। সেই সময় অধ্যাপক ভট্টাচার্য্য আমাদের সম্বর্ধনা দেবার উদ্দেশ্যে একটি সভা ডাকেন—ব্যাক্তি স্বাধীনতা কমিটির পক্ষ থেকে।

আমি খবর পেয়ে বিকেলের ট্রেনে লালমনির হাট থেকে এসে পৌছবার আগেই ব্যাক্তি স্বাধীনতা কমিটির সভা শেষ হয়ে যায়। আমি কোচবিহারে পৌছবার পর শহরের কয়েকটি চৌপথিতে পথ সভা করি। ঐ সভাগুলিতে অধ্যাপক দুর্গাকিংকর ভট্টাচার্য্যও উপস্থিত থাকেন। দু'দিনের শিথিলতা শেষ হতেই আবার আমার উপর কোচবিহার রাজ্য থেকে বহিষ্কারের আদেশ জারী হয়। এই ঘটনার পরেই অধ্যাপক দুর্গা কিংকর ভট্টাচার্য্যকে ভিক্টোরিয়া (অধুনা এ, বি, এন, শীল) কলেজ থেকে বরখাস্ত করা হয়।

এই হ'ল কোচবিহারের সামন্ততান্ত্রিক রাজার অত্যাচারের বিরুদ্ধে ছাত্র সমাজ ও জনগণের সংগ্রামের এক গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা—যা আমাদের স্মরণে রাখতে হবে।

কুচবিহারের স্মৃতি

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

পঞ্চাশের গোড়ার দিকে অর্থাৎ ১৯৫০ নাগাদ বাবা-মায়ের সঙ্গে প্রথম কুচবিহার শহরে বেড়াতে গিয়ে ভারী মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। ছোট্ট একরত্তি শহর। অথচ কী ঝকঝকে তকতকে। মস্ত মস্ত দিঘী, পাম গাছ, ধ্রুপদী স্থাপত্য সব মিলিয়ে শহরটির বহিরঙ্গের রূপ ছিল তুলনারহিত। দেশীয় রাজ্য বলেই বোধ হয় শহরের সৌন্দর্যের প্রতি ব্যক্তিগত উদ্যোগও পরিচর্যা ছিল। তবে রাজ্য তখন গেছে, রাজকীয়তা গেছে, শহর-সৌন্দর্য তখনও পুরোপুরি বিদায় নেয়নি। আমি বক্স ক্যামেরায় পটাপট অনেক ছবি তুলে নিয়েছিলাম শহরের। আজও খুঁজলে আমাদের পারিবারিক অ্যালবামে তার দু'চারটি পাওয়া যাবে।

কে জানে বছরখানেকের মধ্যে ওই শহরে আমাকে পড়তে যেতে হবে। মায়ের কাছ ছাড়া হওয়া একধরণের নির্বাসন। বিশেষ করে ওই বয়সে। কিন্তু সেই দুঃখ বেশীদিন স্থায়ী হয়নি। হস্টেল-জীবনে বন্ধুবান্ধব হতে দেরী হয় না, হৈ-হুল্লোড় খেলাধুলো নিয়ে মেতে উঠলাম। শহরটির ভিতরে এক মায়াময় অভ্যন্তর আছে। সেটার পরিচয় পেতে বিশেষ দেরী হয়নি। ভারী শান্ত উদ্বেগহীন শহর। ঝামেলা ঝঞ্ঝাট কম। লোকজনও বিশেষ নেই। বর্ষাকালে প্রায়ই শহরে জল ঢুকত—এই একটা অসুবিধে ছিল। শীতকালটা ছিল অতি চমৎকার।

এই শান্ত শহরে একটি বীভৎস ঘটনা ঘটেছিল তখন। খাদ্য আন্দোলনের মিছিলে বিনা প্রোরোচনায় পুলিশের গুলি চালানো। আর তারও আগে ছাত্রদের ওপর মিলিটারিদের অকথ্য আক্রমণ। এ ছাড়া শহরটির আর তেমন কোনও কলঙ্ক ছিল না।

কলেজের উল্টো দিকেই ছিল আমার স্কুল। কলেজের একতলা বাড়িটি এত সুন্দর এবং বাগানটি এত নিবিড় যে মুগ্ধ হয়ে যেতে হত। ওই কলেজে কোনও দিন পড়তে পারব কিনা কে জানে. কিন্তু খুব লোভ হত। ভিক্টোরিয়া কলেজের বিশাল খ্যাতি না থাক, ঐতিহ্য ছিল। আর ছিল শৃঙ্খলাপরায়ণতা। রাজার আমলে কলেজটি চলত রাজানুকূল্যে। স্বাধীনতার পর সরকার কলেজের ভার নিয়েছিলেন। কলেজ প্রতিষ্ঠার পর প্রথম দিকে এখানে পড়তে বেতন লাগত না, বাইরের ছাত্রদের হোস্টেলের চার্জ অবধি দিতে হত না। আমার জ্যাঠামশাই কিছুদিন এই কলেজে পড়েন, তাঁর মুখেই শুনেছি।

কলেজের আর একটি গৌরবের ব্যাপার ছিল। একসময়ে এখানে অধ্যক্ষতা করে গেছেন বিশ্রুত দার্শনিক ব্রজেন্দ্রনাথ শীল। তাঁর সম্পর্কে নানা কিংবদন্তী প্রচলিত ছিল লোকের মুখে মুখে।

কুচবিহার দূরবর্তী শহর বলে এখানে বহিরাগতের সংখ্যা বরাবরই কম। ভ্রমণকারী বা পর্যটকের আগমনও বিশেষ ছিলনা। লক্ষ্য করেছি, বাইরের লোকেরা অনেকেই কুচবিহার কোথায় তাও বলতে পারে না। এই তো সেদিনও একজন বলছিল, কুচবিহার ! সে তো আসামে।

এরকম ধারনার অবসান এখন হয়তো হয়েছে। কিন্তু আমি যখন কুচবিহারে পড়তে গিয়েছিলাম তখনও এ

শহর সম্পর্কে বাইরের লোকের ধারনা স্বচ্ছ ছিলনা। একদিক দিয়ে তাতে ভালই হয়েছে। কুচবিহারে তেমন ভীড় বাড়েনি।

পাশ করে কলেজে ভর্তি হলাম সায়েন্স নিয়ে। তখন ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার একটা হাওয়া এসেছে। আমি কী হবো তা সঠিক তখনও জানিনা। তবে ইঞ্জিনীয়ার হওয়ার দিকেই ঝোঁক বেশী ছিল।

টি পি সি ছিলেন পদার্থ বিদ্যার অধ্যাপক। এ টি এম ছিলেন রসায়নের। টি পি সি-কে সবাই কেন যমের মতো ভয় পেত তা এক রহস্য। সুদর্শন ছিপছিপে এই অধ্যাপকের মধ্যে ভয়াবহ কিছুই ছিলনা। কিন্তু ব্যক্তিত্ব ব্যাপারটা এমনই যে, তাকে ঠিক ব্যাখ্যা করা যায় না। তাঁর ক্লাসে পিন পড়লে শব্দ পাওয়া যেত। আর তিনি পড়াতেনও চমৎকার। কিন্তু তাঁর চোখে চোখ রাখতে পারতাম না কেউই। এ টি এম পড়াতেন ভাল, তবে তিনি খোলামেলা মানুষ ছিলেন। নামের অনুষঙ্গে আমরা তাঁকে অ্যাটম বলে উল্লেখ করতাম। বটানি পড়াতেন ক্ষৌণীশ বাবু। এই ক্লাসটি আমার বেশ প্রিয় ছিল।

অধ্যক্ষ সুকুমার গাঙ্গুলি ছোটখাট্টো গৌরবর্ণ মানুষ। অক্সফোর্ডের ডিগ্রি ছিল তাঁর। তেমন তেজী ছিলেন না। কিন্তু ছিলেন নরম সরম ভাল মানুষ। আর একজন চমৎকার নম্র প্রকৃতির মানুষ ছিলেন দেবেন ঘোষ। বাংলার অধ্যাপক।

কলেজের পরিবেশ ছিল অতি চমৎকার। এত মরসুমি ফুল ফুটত যে, কলেজ না হর্টিকালচারের কেন্দ্র তা বোঝা যেত না।

কুচবিহারের লাজুক মেয়েরা ক্লাসে আসতেন অধ্যাপকদের পিছু পিছু। আবার ক্লাস ফুরোলে ওভাবেই কমনরুমে ফিরে যেতেন। কুচবিহার তখনও পুরোনো প্রথা ও মূল্যবোধ ধরে রেখেছে। ছেলেতে মেয়েতে মেশামেশি দেখা যেত না। একটা ছেলে একটা মেয়ের সঙ্গে কথা বললে সেটা খবর হয়ে দাঁড়াত।

শেষ অবধি তীব্র মেলাংকলিয়ায় আক্রান্ত হয়ে ফার্স্ট ইয়ারেই আমাকে পড়াশুনায় খান্ত দিয়ে বাড়ি চলে যেতে হয় কিছু দিনের জন্য। মাস কয়েক পরে ফিরে এসে দেখলাম, বিজ্ঞান ক্লাসে বকেয়া পড়ার ভার এত জমে গেছে যে তা পূরণ করা সম্ভব নয়। একটা বছর নষ্ট হল। পরের বছর আর্টস পড়তে আবার কলেজে ভর্তি হই।

ওই সময়ে দীনেশ ডাকুয়া ও নীরজ বিশ্বাসের বহিষ্কার কলেজের বড় ঘটনা। আর বড় ঘটনা হল, কুচবিহারের বন্যা।

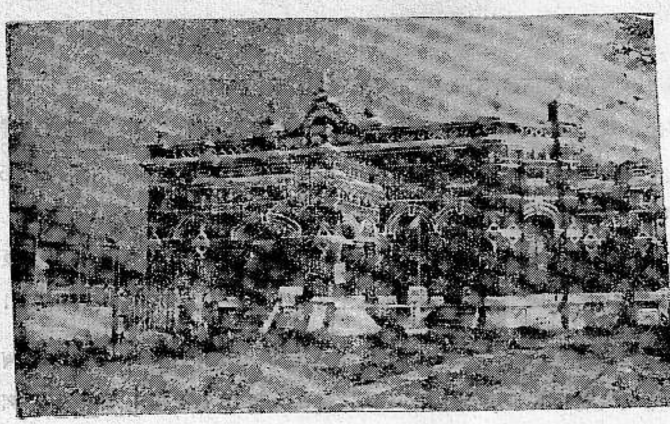
বন্যার কথা বলি। বৃষ্টি হচ্ছিল খুব ক'দিন ধরে। এক সকালে উঠে দেখি, গোটা শহর জলের তলায়। হোস্টেলের এক তলারটিও ডুবতে আর মাত্র ইঞ্চি কয়েক বাকি। আমাদের মধ্যে আমি সমেত গোটা পাঁচেক ছেলে সাঁতার জানত। আর কেউ জানলেও সেটা কবুল করেনি। হোস্টেল পরিচালক ক্ষৌণীশ বাবুর নির্দ্দেশে আমাদের জলে নেমে পড়তে হল উদ্ধারের কাজে।

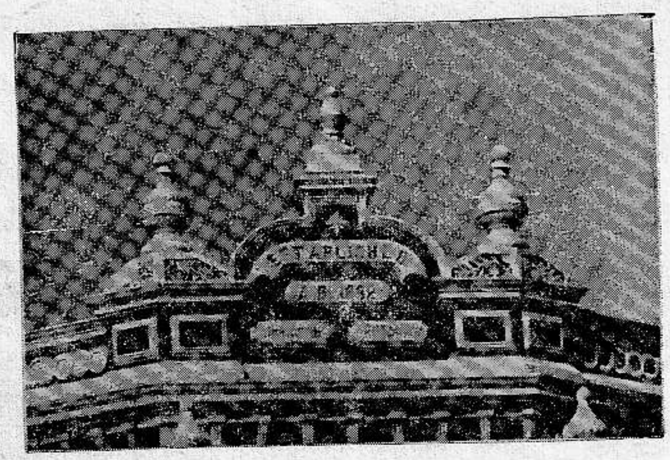
বন্যার কয়েকটা দিন কী অমানুষিক পরিশ্রম যে করতে হয়েছে তা বলার নয়। সারা দিন কাটত জলে। গলা অবধি নোংরা জলে ডুবে থেকে চামড়া সাদা হয়ে যেত। কলেজে আগত শরনার্থীদের খিচুড়ি, গরম দুধ ইত্যাদি বয়ে নিয়ে গিয়ে পরিবেশন করতে হত। তার মধ্যেও কিছু রাজনীতির লোক ঢুকে ঘোঁট পাকিয়ে লোকজনকে

এমন ক্ষেপিয়ে তুলল যে, এক বিকেলে আমরা মার খেতে খেতে বেঁচে গেলাম। কিছু তৌড়িয়া লোক যখন আমাদের ঘিরে ধরে মারধর করতে আস্তিন গোটাচ্ছে তখন আমরা এত ক্লান্ত যে, কেন মারতে চাইছে তা ভাল করে বুঝতেও পারছিনা। থ হয়ে দাঁড়িয়ে আছি মাত্র। তাদের ধারণা হয়েছিল যে, খিচুড়ির চাল ডাল এই সব সরকার থেকে আমাদের দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু আমরা তা ওদের পরিমাণ মতো দিচ্ছি না। কে ওদের বোঝাবে যে, এই প্রলয়ংকর বন্যায় সরকারও অগাধ জলে। আমরা যা দিচ্ছি তা আমাদেরই হোস্টেলের চাল ডাল। দুধের ব্যারেলটি অবশ্য হাসপাতাল থেকে ডঃ নৃপেন্দ্র দাস পাঠিয়ে দিয়েছিলেন দয়া করে।

শেষ অবধি অবশ্য এক রাজবংশী বৃদ্ধা আমাদের বাঁচাতে রুখে দাঁড়ালেন। তাঁর দেখাদেখি আরও অনেকেই এগিয়ে এলেন আমাদের বাঁচাতে। সে যাত্রা মারের হাত থেকে বেঁচে গেলাম। আর তার পরেও যথারীতি গভীর রাত অবধি শরনার্থীদের সেবা করে যেতে হয়েছে। আশ্চর্যের বিষয় অত জল ঘেঁটেও কিন্তু সর্দি, কাশি, জ্বর কিছুই হয়নি।

কুচবিহারের কলেজ জীবন সম্পর্কে বলতে বসলে সাত কাহন। গোটা স্মারকপত্রেও কুলোবেনা। ইচ্ছে আছে কখনও লেখব। কুচবিহার শব্দটাই আমার কাছে ম্যাজিকের মতো কাজ করে। এখনও করে।





Reminscences of a 'Victorian'

Kumar Promodendra Narayan
Ex-Student

I am informed of the Centenary Celebration of the 'Victoria College.' Why shouldn't I try to recollect my sweet reminiscence with my Alma Mater, though the 'Victoria College' has changed its colour and creed so suddenly to bewilder us ?

The most vivid impression in me is the conquest of the much competitive Elliot Football Shield by our 'Victoria College' for the first and the last time (probably in 1919). Yet now I remember some of our sportsmen of the team. They were Biren Neogi, Makhan Sikdar, Sashi Sarkar, Dwijesh Guha, Jatindra Roy and the two backs Priya Bhusan Sen and Kumar Suren. Funny it was that Kumar Suren, then a student of Jenkins School, Cooch Behar, was unavoidably found necessary to be included in the College team which succeeded so nicely in the team-work. And under the Principal's desire I gladly took a photograph of this Winner Team in the College precinct.

It is needless to add that Gosto Pal and Kumar Suren were then the main pair of Mohon Bagan backs to fight with the European, Military and Highlanders teams.

Another fact that I remember is that the College Hostel (now a part of Maharaja Nripendra Narayan High School) had many students hailing from adjacent places of Bengal. It was then the Gandhian epoch. The hostelers made united demand that their food must be improved and they would pay the increased expense for that ; and if their demand be not met, all students would resort to strike in the College. The Hostel Superintendent was not in favour of the demand. On a morning I found Maharaja at my house and finding me there smiled and uttered, "তুইও কলেজে যাস নি ?" I silently smiled.

Next day Maharaja held a meeting in the College premises with the teachers and the students. In the meeting Maharaja expounded the cause of education and the necessity upholding the cause of the poor students and declared that the unwilling rich students may leave the college.

Another event of attachment to my Alma Mater, the Victoria College should not be left out.

I was a student in the St. Xaviers College, Calcutta. The B. Sc. got its start in the Victoria College. There were only four students at its beginning. The Principal communicated that for the interest of the College he wished that I may be one of the first batch of examinees in the B. Sc. . For the interest of our College and having respect to my teacher's request, I obeyed his wishes and left so good a College as St. Xaviers and after a year's study appeared in the B. Sc. examination with five of my class.mates to come out successful. I still remember some class-mates, —Anil Chakrabarty, Gajen Basunia, Haripada Chakrabarty, Jnanendra Guha.

We freely used our good laboratories with chemicals and accessories always available. There were Rukhan Routh, Tikendrajit (Roy ?) and Fatick Das to help in the Physics and Chemistry demonstration. With gratitude I remember Manaratha Dhan Dey and Phanindra Nath Chatterjee who taught us Science, and also Nagendra Nath Basu teaching Mathematics.

The Centenary naturally draws us back to the date of foundation of the 'Victoria College' and the founder the Maharaja. It is expected that the founder had then an object in view for the institution. And so, learned and wise men were searched out and engaged to impart to the pupils, knowledge and wisdom. Not the money or pomp but discipline and sobriety ruled the College environment having Guru Sisya relation which is always a must to be in the teacher and the pupil. Thus the 'Victoria College' came to be one of the foremost institution in Cooch Behar and Bengal, specially when M.A. and Law classes were being broughtin the courses.

My hearty thanks to the Centenary Celebration Committee for kindly allowing scope to an old student to express himself towards Commemoration of the 'Victoria College' by the able Committee.

I am thankful to Sree Makhan Sen on whose request I am obliged to note the above from my recollection at this my eighty eight years of age.

বিশেষ প্রতিবেদন ঃ

পরমক্ষণের প্রতীক্ষায়

সনৎকুমার ঘোষ

দুপুরের উজ্জ্বল আলোয় বৈদগ্ধ্যের হোমাগ্নি ঘিরে জমজমাটি আসর। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, সাহিত্যের তর্ক বিতর্কে তুফান ওঠে। স্থান-কাল-পাত্র ভুলে সবাই একহয়ে যায় শতবর্ষের পুন্য অনুষ্ঠানে। এই ভালোবাসার সময়ে আপনার হাতে এলো—স্মরণিকা।

বিকেলের শেষে রক্তিম আলোয় মহাবিদ্যালয় প্রাঙ্গনে এক তীব্র নষ্ট্যালজিক আবেগের আলো আঁধারি। প্রদর্শনীর দোরে দোরে আপনার বিস্ময়ের মাত্রা বাড়ে। পুরোনো বন্ধুর সাথে হারানো স্মৃতির রোমন্থন। এই ভালোলাগার ক্ষণে আপনার হাতে এলো— স্মরণিকা।

অজস্র আলোকমালায় সজ্জিত রজনী। বিচিত্র আতসবাজীতে মহাবিদ্যালয় উদ্ভাসিত। সুনিপুন কন্ঠের আবৃতি ও সঙ্গীত গড়ে তোলে সুরের মায়াপুরী। এই মহান রাত্রির পুণ্য লগ্নে আপনার হাতে এলো— স্মরণিকা।

এই বিস্ময়, আলো, সঙ্গীত ছেড়ে একটু পেছন ফিরে দেখি।

শতবর্ষ! শতবর্ষ! কালের মহাসমুদ্র পেরিয়ে এই ডাক ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে আসতে শুরু করেছিলো বেশ কিছুদিন আগে থেকেই। বারবার। আবার সময়ের বিভিন্ন চাহিদায় তা ভেসেও গেছে। ৮৭-র মাঝামাঝি এক সাধারণ সভা হলেও ১৯৮৮-র প্রথম মাসে সমস্ত শহরের প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী ও উৎসাহী নাগরিক বৃন্দদের আহ্বান করে প্রথম আনুষ্ঠানিক সভাটি হয়। প্রাথমিকভাবে একটি 'ওয়ার্কিং কমিটি'ও গঠন করা হয়, যারা পরবর্তী কর্মপদ্ধতি স্থির করবে। পরবর্তী একটি সভায় কয়েকটি সাবকমিটি গঠন করা হয় এবং ১৫ই জুন, ১৯৮৮ শতবর্ষ পূর্তি উৎসবের প্রারম্ভিক দিন হিসেবে ঠিক করে সেদিন একটি অনুষ্ঠান করার সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয়। প্রস্তুতি ও প্রচার চলে পাশাপাশি। একটি স্থায়ী শতবার্ষিকী অফিস খোলার সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয় এবং শুরু হয় প্রাথমিকভাবে অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা।

ছাত্রদের ইচ্ছা ও চেষ্টার ত্রুটি না থাকলেও প্রকৃতি বিরূপ হলো। ১৫ই জুনের আগের দিন রাত থেকেই অঝোর বৃষ্টি। তবু তারই মাঝে জড়ো হলেন প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্র-ছাত্রীরা। নলিনীকান্ত দে সরকার ও গোপালকিশোর রায় ও তাঁদের শতাব্দীর অভিজ্ঞতা নিয়ে সেই ঝড় জলে নবীনদের সঙ্গ দিলেন। তারাই প্রদীপ প্রজ্জ্বালন ও পতাকা উত্তোলন করে শতবর্ষ পূর্তি উৎসবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন। বৃষ্টিতে ভিজে ভিজেই উৎসাহী ব্যক্তিরা বৃক্ষরোপন করলেন। বিকেলে অনুষ্ঠিত হলো প্রাক্তন ও বর্তমানদের মধ্যে একটি চিত্তাকর্ষক ফুটবল ম্যাচ। সেই মেঘমন্দ্রিত রাতে রবীন্দ্রভবনে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যোগ দিলেন সুনীল দাশগুপ্ত সহ বিভিন্ন প্রখ্যাত শিল্পীরা। কিশোর বাহিনী পরিবেশন করলো তাদের অনবদ্য দলনৃত্য।

ঠিক হয় মূল অনুষ্ঠান হবে ১৫-২১শে ডিসেম্বর। চিঠি পাঠানো হয় প্রবাসী প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী ও সংশিল্ষ্ট ব্যক্তিদের। কিছু অর্থগ্রহনও হয় বিভিন্ন অঞ্চল থেকে। কিন্তু পুজোর দীর্ঘ ছুটির ফলে যথোপযুক্ত যোগাযোগের অভাব ও সর্বোপরি আর্থিক কারণেই মূল অনুষ্ঠান মাস দুয়েক পিছিয়ে ১৫-২১শে ফেব্রুয়ারী ধার্য হয়। শুরু হয় পূর্ণ উদ্যমে কর্মযজ্ঞ। প্রতিদিন সারাদিন ধরে খোলা থাকে শতবর্ষ অফিস।

মেলায় ১৫দিন ধরে একটি বিশেষ শতবার্ষিকী স্টল খোলা রাখা হয়। যোগাযোগ ও অর্থসংগ্রহ চলে। শহরের বিভিন্ন অঞ্চলকে ভাগ করে অর্থসংগ্রহের প্রচেষ্টা শুরু হয় প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে। 'স্মরণিকা'র বিজ্ঞাপন ও অন্যান্য সকল উৎস থেকে অর্থসংগ্রহের অক্লান্ত প্রচেষ্টা চলে। 'স্মরণিকা'য় লেখা পাঠানোর জন্য বিভিন্ন বিষয়ের প্রখ্যাত ও মহাবিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র বা অধ্যাপকদের আমন্ত্রন জানানো হবে। সেমিনার ও প্রদর্শনীতে যোগ দিতে যোগাযোগ করা হয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিত্বের সাথে। বেতার ও বিভিন্ন সংবাদপত্রেও জোর প্রচার চলে।

যতদূর সম্ভব ছাত্র-ছাত্রীদের খোঁজ করে চিঠিপত্র দেয়া চলছেই। ভারতের তথা বিদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তারা অর্থ ও উৎসাহ দিয়ে চলেছেন। বৎসরের প্রথমেই ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহিত করার জন্য প্রকাশিত হলো 'সংসদবার্তা' তবু শতবর্ষের ব্যাপক কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য যে বিপুল অর্থ ও আয়োজন প্রয়োজন তার অনেকাংশই বাকী। কলেজের প্রাক্তন ছাত্র ও বর্তমান স্থানীয় রাজ্য মন্ত্রীদের উপস্থিতিতে কলকাতায় এক জরুরী সভায় মার্চের প্রথম সপ্তাহে এই অনুষ্ঠানের দিন ধার্য করা হয়। সেদিনই তা দূরদর্শনের সংবাদের মধ্যদিয়ে প্রচার করা হয়। উত্তর বঙ্গ সংবাদ, বর্তমান সহ বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় কলেজের উপর সংবাদ প্রকাশ করে এবং প্রচারও করা হয়। বিভিন্ন স্থানীয় শহরে সিনেমা হল গুলিতে স্লাইডও দেওয়া হয়। অর্থ সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন মাধ্যমে পাশ্ববর্তী বিভিন্ন শহরে প্রচেষ্টা চলে। কলকাতায় একটি বিশেষ তহবিল প্রতিষ্ঠা করা হয়। পাশাপাশি অনুষ্ঠানকে আকর্ষণীয় ও সর্বোত্তম করার জন্য সঙ্গীত, আবৃত্তি, নাটক, সাহিত্য, অর্থনীতি, বিজ্ঞান, রাজনীতি প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের দিকপালদের সাথে যোগাযোগও চলে।

শতবর্ষের পূর্ণতা শুধু পাঁচ/সাত দিনের অনুষ্ঠানে নয়। তাই বেশ কিছুদিন আগে থেকেই কলেজের সর্বাঙ্গীন উন্নতিকল্পে সবরকম প্রয়াস চলে। তারই ফলস্বরূপ মহাবিদ্যালয়ের প্রাচীন ভবন সংস্কারের জন্য প্রায় তিন লাখ এবং কলেজ ও ছাত্রাবাস প্রাচীরের জন্য এক লাখ টাকা করে অনুমোদিত হয়। তদুপরি বিভিন্ন স্থায়ী সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা চলে। মহাবিদ্যালয় প্রাঙ্গনের বিরাট ফুলের বাগানটিকে পুনরায় সুন্দর করে তোলা হয়। সমস্ত ভবনের দেয়াল নতুন রঙে রঙীন করে তুলে সমস্ত দেয়াললিখন ও পোষ্টার পরিস্কার করার কাজও চলে। এছাড়াও গড়ে উঠতে থাকে সুবিশাল ও কারুকার্য খচিত শতবার্ষিকী তোরণ।

ততোদিনে সারা কলেজের প্রতি ছাত্র-ছাত্রী সহ শহরের সকল উৎসাহী নাগরিক ঝাঁপিয়ে পড়েছে এই মহান কর্মযজ্ঞে। সদরের সমস্ত এলাকা সহ বিভিন্ন অফিস ও স্কুলগুলিতে ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে বেরিয়ে পড়ছেন বিভিন্ন অধ্যাপক ও ব্যক্তিত্বেরাও। তাছাড়া প্রতিদিন বিভিন্ন স্থানীয় শহর অঞ্চলেও গাড়ী নিয়ে কালেকশান চলছে। পাশাপাশি রয়েছে ব্যাপক প্রচার ব্যবস্থা। প্রতিদিন রাত নটা-দশটা অবধি বিভিন্ন বিভাগের আলোচনাসভা হচ্ছে প্রত্যেকে মিলিত হচ্ছেন তাদের সমস্যা ও তথ্য নিয়ে। প্রতিনিয়ত সৃষ্টি হচ্ছে নতুন কাজ ও পরিকল্পনা। বিভিন্ন পরামর্শের মাধ্যমে বারবার সাবধান করে দেয়া হচ্ছে সেচ্ছাসেবকদের। একটা সাজো সাজো রব চারিদিকে।

একটা দীর্ঘ পথ অতিক্রমনের প্রায় শেষ। গন্তব্যের মাইলষ্টোন আর খুব একটা দূরে নয়। তবু সাবধানে চলতে হবে বাকী পথ টুকুও। যেন কোনো মুহূর্তের ভুল ভ্রষ্ট না করে এই মহতী প্রচেষ্টা। নতুন শতাব্দীর দ্বার প্রান্তে দাঁড়িয়ে নতুন শপথ নিয়ে চলতে হবে আমাদের আরো অনেক পথ।

কোচবিহারের স্মৃতি

হরপ্রসাদ মিত্র

১৯৫২-র প্রথমার্ধ থেকে ১৯৫৪ পর্যন্ত আমি কোচবিহার সরকারী মহাবিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক ছিলুম। তখন তার নাম ছিল ভিক্টোরিয়া কলেজ। পরে হয় ব্রজেন্দ্রনাথ শীল কলেজ। ব্রজেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে খুবই কৌতূহল ছিল। তাঁর আমলের এক প্রবীণ কর্মীকে পেয়েছিলুম ঐ কলেজেই। তিনি বোধ হয়, তাঁর খাস-বেয়ারা ছিলেন। তিনিই বলেছিলেন যে ব্রজেন্দ্রনাথ যখন শৌচাগারে যেতেন তখনো তাঁর সঙ্গে থাকতো বই। শুনে অবাক হয়েছিলুম। ব্রজেন্দ্রনাথের পাণ্ডিত্যের ঐতিহ্য তো বটেই, তাছাড়া কোচবিহারের রাজবাড়ি, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের কন্যার বিবাহ সেই রাজবাড়িতে—এবং ছিমছাম পরিচ্ছন্ন শহরটির খ্যাতি,—ওখানকার সংগীত, জ্যোতিষ ও সংস্কৃতচর্চার কাহিনীও অনেক শুনেছি। কিন্তু কোচবিহার খুবই ঠাণ্ডা জায়গা—এই খবরে বিভ্রান্ত হয়ে ভারি পশমের জামা পরে প্রথম ওখানকার বিমান-বন্দরে নেমেই আমাকে গরম জামা খুলে ফেলে হালকা হতে হয়। সেটা বোধ হয় এপ্রিল মাস। সকালে সন্ধ্যায় ঠাণ্ডা বোধ হোতো, কিন্তু দুপুর বিকেল কম তপ্ত নয়।

তখন বাংলা বিভাগের অন্যতম অধ্যাপক ছিলেন দেবেনবাবু—দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ। রাজাদের আমল থেকেই ঐ কলেজে তাঁর কাজ শুরু হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার যখন প্রশাসনে এলেন, আমরা ছিলুম সেই পরবর্তী আমলের নবাগত। পূর্বনিযুক্ত কোনো কোনো নবীন প্রবীণ কর্মী আমাদের সম্বন্ধে বোধ হয়, সংশয়ক্লিষ্ট ছিলেন। কিন্তু তাতে আমাদের হৃদ্যতা ব্যাহত হয়নি। ইংরেজির শান্তিবাবু, সুহাসবাবু, বাংলার দেবেনবাবু, পদার্থ বিজ্ঞানের তারাপ্রসাদবাবু, অর্থবিদ্যার চিত্তবাবু প্রভৃতি পূর্বনিযুক্তেরা আমাদের মতন নবাগতদের সুখ-সুবিধার প্রতি নজর রাখতে কোনো কার্পণ্য দেখান নি।

প্রথমদিন ইন্টারমিডিয়েট আবশ্যিক বাংলা ক্লাসে গিয়ে ছাত্রদের হাজিরার খাতায় অনেকের নামের আগে 'কুমার' দেখে আমি কৌতূহলী হই। চেহারায় কোনো রাজবিভা নেই, অথচ রাজকুমার সব,—ব্যাপারটি বুঝতে না পেরে পরে সহকর্মীদের জিগেস করি। সেই প্রথম আমি 'রাজগণ' শব্দটি উচ্চারিত হতে শুনি এবং ধীরে ধীরে কোচবিহারের অন্তরের প্রবেশ পথ খুলতে থাকে আমার কাছে। বিকেলের আলোয় রাজবাড়ির দিকে তোড়শার তীর ধরে খয়ের-গাছের জঙ্গল দেখতে দেখতে হেঁটেছি অনেক। গোসানিমারি-তে গেছি, রাজাভাতখাওয়ার কাহিনী শুনেছি,—রাজপরিবারের উজ্জ্বল এক পুরুষকে ঘোড়ায় চড়ে টহল দিতে দেখেছি প্রশস্ত মসৃণ টারম্যাকে। এবং ফুল ছিল দিকে দিকে সর্বত্র। ভারি সুন্দরী ছিল প্রকৃতি। কলাগাছগুলি অতিকায়, সুপুরিগাছগুলি আকাশচুম্বী, বাঁশবন দীর্ঘদেহী এবং বাঁশের বাঁখারির বেড়াগুলিতে শোভন কারুকার্য। তোড়শার রেলসাঁকো পর্যন্ত সাইকেল-রিক্সায় ঘুরতে যেতুম প্রায়ই। জ্যোৎস্নায় যাকে বলে ফিনিক ফুটতো। নির্মল সিংহ ছিলেন ইতিহাসের অধ্যাপক যিনি পরে প্রেসিডেন্সি কলেজে আমার সহকর্মী ছিলেন, আরো পরে মধ্যশিক্ষা পর্ষদে চলে যান উচ্চপদে,—আরো পরে কলেজ-সার্ভিস কমিশনের অন্যতম সদস্য হন। সেই নির্মল আমার অনুজপ্রতিম, কিন্তু আমরা পরস্পরকে 'তুই' বলতুম।

রেললাইন ধরে হাঁটতে হাঁটতে আমরা অনেক বিকেলে গেছি বিমান-বন্দরের দিকে। ট্রেন চলে গেছে একটু আগেই। ট্রেনের চাকায় বড়ো বড়ো সাপ কাটা পড়ে আছে দেখে ভয়ে রেললাইন ছেড়ে দুজনেই তাড়াতাড়ি হাঁটাপথে নেমে গেছি—এই ছবিটা এখনো দেখতে পাই।

আমরা বাস করতুম কলেজের বিশাল লম্বা দোতলা ছাত্রাবাসেই। আমি পেয়েছিলুম একতলায় থানার দিকের প্রান্তিক ঘরটি। তার পাশের ঘরে ছিলেন দর্শন-বিভাগের কাত্যায়নীদাস ভট্টাচার্য যাঁকে পরে আবার পাই প্রেসিডেন্সি কলেজে সহকর্মী রূপে এবং যিনি অকালপ্রয়াত হন ১৯৬৬-তে। ছিলেন জীববিজ্ঞান-উদ্ভিদবিজ্ঞানের অধ্যাপক ক্ষৌণীশ বিশ্বাস,—ছিলেন জেংকিন্স স্কুলের শিক্ষক নির্মল সান্যাল,—ছিলেন আমাদের সহকর্মী সংস্কৃতের ননীবাবু। আমাদের সকালের টি-ক্লাবের সুগৃহিনীর ভূমিকায় ছিলেন স্মিতহাস্যময় ক্ষৌণীশ বিশ্বাস যাঁর ডিমসিদ্ধ আধাআধি ভাগ করবার দক্ষতা দেখতে আমার ভাল লাগতো। ঘরের দুই বিপরীত দেয়ালে লম্বালম্বি বাঁধা জামাকাপড়ের সরু তারে পুরো ডিমসিদ্ধটি হালকা চাপে অর্ধেক করে নিয়ে তিনি আমাদের পরিবেশন করতেন। আমরা চায়ে চুমুক দিতে দিতে মহাকরণে শিক্ষা-বিভাগের বদলি-বিধাতাদের মর্জি সম্বন্ধে,—কমলবাবু নামে সেকালের শিক্ষা-ডিরেক্টরেটের সেই সর্বপ্রিয় মানুষটির বিষয়ে আলাপ করতুম। তখন শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন টাকির জমিদার হরেন্দ্রকুমার রায়চৌধুরী মশাই। তিনি ছিলেন ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের প্রিয়পাত্র। আমরা বলতুম, বিধানবাবু এতো বড়ো ডাক্তার, কিন্তু হরেন বাবুকে তিনি যদি কিছুদিনের জন্যে কোচবিহার ভিক্টোরিয়া কলেজের ছাত্রাবাসে চেঞ্জে পাঠাতেন তাহলে তাঁর শুচিবায়ু নিশ্চয় সেরে যেতো।

এইরকম খোশগল্পের পরে আমরা যে যার ঘরে চলে গিয়ে কিছুক্ষণ পাঠাভ্যাস করতুম,—তারপর ছাত্রদের সঙ্গেই পাশাপাশি খোলা আকাশের নিচে স্নান,—আহারও পাশাপাশি ডাইনিং রুমে মেঝেতে পিঁড়ি পেতে—গরম ভাতে ছোটো ছোটো পাথর, পাতলা ডাল, লাল্‌চে-হলুদ রঙের অনেকটা হালকা ঝোলে এক টুকরো মাছ এবং প্রায়ই অনেকটা শোলাকচু-ভাজা—প্রধানত এই ছিল আমাদের ছাত্র-শিক্ষকের লাঞ্চ।

তারপর আমরা পেছনের মাঠটা পেরিয়ে কলেজে যেতুম। ছাত্ররা ছিল সরল, শান্ত। দু'একজন ছিল অপেক্ষাকৃত চালাক-চতুর, যেমন বিধানবরণ মুখোপাধ্যায়—যে বোধ হয় পরে সাংবাদিক হয়,—ছিল কবি পরেশ সোম,—আর শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় যে এখন স্বনামধন্য সাহিত্যিক। একজনের কথা আমার প্রায়ই মনে পড়ে আজো। বানারহাটে তার নিবাস। আমি ওখানে অনেক বেতবন দেখে সেকথা তাকে বলেছিলুম। সে আমাকে অচিরেই একগাছি সরু বেত এনে দেয়। নানা জায়গায় ঘুরতে ঘুরতে সেই বেতটা হারিয়ে গেছে, ছেলেটির নামও ঠিক মনে পড়ে না, কিন্তু তার সেই কিশোর বয়সের মমতা আছে আমার আপন সন্তানের স্মৃতি হয়ে। মনে পড়ে পরিমলের কথা,—যে হয়েছে অধ্যাপক, মনে পড়ে রমেন অধিকারীর কথা যার তুফানগঞ্জের বাড়ীতেও গিয়েছিলুম এক সন্ধ্যায়। রমেনও প্রতিষ্ঠিত অধ্যাপক এখন,—থাকে উত্তরবঙ্গেই। আমি যখন গুড়িয়াহাটে একটি বাসা ভাড়া নিয়ে সপরিবারে ছিলুম, তখন অনেক ছাত্রই আসতো সেখানে।

কলেজে ছাত্রদের মমতা তো পেয়েছিলুম, কিন্তু তাদের আমি কতোটুকু সাহায্য করতে পেরেছি?

পড়াতুম উৎসাহে, আনন্দে। কিন্তু আরো তথ্য দিতে চাইতুম। সেদিক থেকে তখনকার ঐ কলেজের লাইব্রেরি ছিল পিছিয়ে—যদিও কলেজটি তো বহুকালের। কলেজের বাইরে প্রসিদ্ধ যে গ্রন্থাগারটি ছিল, তাতে পুরোনো পুঁথিপত্রের ভাণ্ডার। আমার মাস্টারমশাই শশিভূষণ দাশগুপ্ত একদা তার গ্রন্থতালিকা ও পরিচিতিও তৈরী করে গেছেন। কিন্তু আধুনিক ইংরেজি বাংলা বইপত্রের লক্ষনীয় অভাব ভোগ করতে হয়েছিল ভিক্টোরিয়া কলেজের লাইব্রেরিতে। রবীন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর, শরদিন্দু, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মোহিতলাল মজুমদার, ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেকেরই অনেক বই ছিল না। আর, সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞান, শিল্পকলা ইত্যাদির রেফারেন্স-ডিক্শনারি ইংরেজিতে কলকাতায় যে রকম পেতে অভ্যস্ত ছিলুম, কোচবিহারে সেক্ষেত্রেও নিরবধি আকাশের শূন্যতা। কিছু বই ছিল ছাত্রাবাসের এক বদ্ধ আলমারিতে। কিন্তু সে যে কার জিম্মায় সেটা জানতুম না। বাজারে বইয়ের দোকানও ছিলনা তখন। জ্ঞান ব্যাপারটাই যে আহরণ ও আত্তীকরণের বিষয়, একথা শিক্ষাবিভাগের কর্মকর্তারা কেন যে আরো খেয়ালে রাখেন না, তা তো ভাবতেই হয়। আমিও ভাবতুম। গবেষণার জন্যে লাইব্রেরি চাই। কোচবিহারে লোকসাহিত্য সম্বন্ধে সরেজমিন তদন্ত ও সঞ্চয় সম্ভব ছিল, কিন্তু আমার আগ্রহ ছিল ছাপা বইয়ের দিকে। বাজারে গিয়েও সে-বিষয়ে হতাশ হয়ে অগত্যা আমি 'সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা ও বাক্যরূপ' নামে বইটি লিখে ফেলি আমার সামান্য মাইনের টাকায় উড়োজাহাজে শ্রীরামপুরের বাড়ি থেকে বেশ কয়েক ঝুড়ি বই, পত্র-পত্রিকা, নোটখাতা বারবার নিয়ে গিয়ে এবং ফেরৎ নিয়ে। তখন ভাগ্যিস মালবাহী ড্যাকোটা হাওয়াই জাহাজের চলাচল ছিল কলকাতা বা ব্যারাকপুর আর কোচবিহার-ধুবড়ির মধ্যে। একবার আগরতলাতেও নেমেছিল জাহাজ। পাইলটরা চেনা বন্ধু হয়ে গিয়েছিলেন। কলকাতা থেকে যাবার ভাড়া বেশি ছিল। কিন্তু ফেরার ভাড়া পঁচিশ-তিরিশেও নামতো। সাইকেল-রিক্সায় ভেঁপু বাজিয়ে ঘোষণা হোতো কলকাতার ভাড়া তিরিশ-পঁয়ত্রিশে নামলো। তখন আমাদের মন আনচান করতো।

বিষ্টির বড়ো বড়ো ফোঁটা এবং সেপ্টেম্বরের বায়ু চলাচলহীন গুমোট,—যত্রতত্র সাপ এবং বাজারে ব্রহ্মপুত্রের বড়ো বড়ো মাছ,—বড়োসড়ো গাছে কী একরকম ছোটো ছোটো ফুল,—গ্রীষ্মের কোনো কোনো সন্ধ্যায় শহরের কোনো কোনো প্রান্তে জোনাকির আলো-বিছানো মাঠ,- কোচবিহার সম্বন্ধে এইসব স্মৃতিই আমার স্বপ্ন হয়ে আছে। যখন সেখানে অধ্যাপক ছিলুম তখন জোর এক পশলা বিষ্টি এলেই ক্লাশ ছেড়ে দিতে হোতো। কারণ, টিনের ছাদে বড়ো বড়ো ফোঁটায় বর্ষণের শব্দ যে কী অকল্পনীয় প্রচণ্ড বাজনা, তা কেবল ভুক্তভোগীরাই জানেন। রমেশবাবু ছিলেন গণিতের অধ্যাপক, আর ভরতবাবু ছিলেন কলেজ-আপিশের করণিক। দুজনেই সদাপ্রসন্ন মানুষ। একদিন বিষ্টির সময়ে রমেশবাবু আপিশঘরে এসে ছাত্রদের হাজিরার খাতা, চকখড়ি, ডাস্টার শেল্‌ফে রেখে বললেন 'হু'।—ভরতবাবু বললেন, এক সপ্তাহ এইরকমই চলবে স্যার। ইতিমধ্যে বন্যাও এলো। আমি তখন আলাদা বাসাবাড়িতে ভাড়াটে। রাত-দুটোয় লণ্ঠন হাতে নিয়ে ছাত্ররা এলো। তারা আমাদের নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে যেতে আগ্রহী। লটবহর নিয়ে নড়তে রাজি হইনি বটে, কিন্তু তাদের সেই আগ্রহের আমন্ত্রণ কি ভুলতে পারি ?

পাতলাখাওয়ার জঙ্গলে যেতুম। একবার একজনের বাতের যন্ত্রণা হচ্ছিল খুব। মনে আছে, ভরতবাবু তাঁকে বললেন,—কচি গণ্ডারের মাংস খেয়ে দেখুন। আমি এরকম ওষুধ ও পথ্যের উল্লেখও পাইনি তৎপূর্বে। গণ্ডার ছিল বটে ওদিকটায়। তোড়শার কিনারা ধরে হেঁটেছি অনেক দূর। একবার ছেলেদের নিয়ে লঙ্কাপাড়ায় গিয়েছিলুম আমরা। ফেরবার সময়ে পাহাড়ে আগুন লাগতে দেখেছি, হয়তো দাবানল, হয়তো কোনো দলের পিকৃনিকের উল্লাসাবশেষ! কোচবিহারের মধ্যে মদনমোহনতলার মন্দিরে যেতুম প্রায়ই,—সাগরদিঘির চারপাশে হাঁটতুম, আকাশ পরিষ্কার থাকলে কাঞ্চনজঙ্ঘার তুষারকিরীট দেখা যেতো। সেই কোচবিহার থেকেই আমি প্রথম বাসে চেপে শিলিগুড়ি হয়ে দার্জিলিঙে যাই। দার্জিলিঙের অবজারভেটরি হিল থেকে ফিরে তাকাই কোচবিহারের সবুজ প্রশান্ত সমতলের বিস্তারে। তখন আমাদের মন ছিল তৃষ্ণার্ত, দৃষ্টি ছিল এখনকার চেয়ে অবশ্যই তীক্ষ্ণতর। আমার অনেক বন্ধু ছিলেন কোচবিহারে। সহকর্মীরা তো বটেই, তাছাড়া অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন ফিশারিজ-অফিসার নন্দলাল খান যাঁর সঙ্গে সারারাত তোড়শায় নৌকাভ্রমণ করে সকালে দেখেছি চরে বসে আছে যূথবদ্ধ চখাচখী। একদিন নৌকো থেকে নেমে উঁচু বাঁধ পেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ দেখেছি আশ্চর্য এক লঙ্কার ক্ষেত—বোধ হয় কয়েক মাইল তার বিস্তার,—গাঢ় সবুজ পাতার সঙ্গে টকটকে লাল পাকা লঙ্কার মোজেক!

মনে পড়ে, শান্ত মানুষ অঙ্কের মধুবাবুকে। মনে পড়ে অধ্যক্ষ এস, এন, গাঙ্গুলিকে। মনে পড়ে অমিয়ভূষণ মজুমদারকে—কলেজসূত্রে নয়,—তাঁর সাহিত্যপ্রতিভাসূত্রেই। বীরেশ্বর বসু ছিলেন দলসিংপাড়া চা-বাগানের বড়োবাবু—যাঁর সঙ্গে আমি দলসিংপাড়াতেও কাটিয়ে এসেছি কয়েকদিন। পরে প্রকাশক হন তিনি। আমার 'কবিতার বিচিত্র কথা' বইটির তিনিই ছিলেন প্রথম প্রকাশক। পরে ফরোয়ার্ড ব্লকের বিধায়ক ও কবি অপরাজিতা গোপ্পী তখন ছিল কিশোরী মেয়েটি। তাকে পেয়েছিলুম একজন শ্রমিকনেত্রীর অঙ্কুর রূপে। তার সঙ্গে এখনো মাঝে মাঝে দেখা হয়। কিন্তু শুনেছি তাদের কোচবিহারের চমৎকার বাগান আর নেই বুঝি। সবই বদলে দেয় সময়। যা থাকে, তারই নাম স্মৃতি।

আমাদের কলেজ ও আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল

শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী

কলেজ যাবার প্রথম অভিজ্ঞতার কথা আজও আমার স্পষ্ট মনে আছে। তখন আমি স্কুলের ছাত্র, পড়ি নিচের ক্লাসে। আমাদের স্কুল আর কলেজ পাশাপাশি। আমরা একটা টিনের লম্বা চালাঘরে পড়ি। মাঝখানের খেলার মাঠ পেরিয়ে পাকা বাড়িতে পড়ে ওপরের ক্লাসের ছাত্ররা। আমাদের মাঠের ওপারেই কলেজের মাঠ। মাঝখানে পাঁচিল নেই। বেড়াও নেই। কলেজেও দুটো বাড়ি। একটা পাকা আর একটা আমাদেরই মতো টিনের চালা। কে কোথায় পড়ে তা জানিনা।

একদিন দুপুরে কলেজের কয়েকটি ছেলে এসে আমাদের ক্লাসের মাষ্টারমশাইকে কিছু বলল। মাষ্টারমশাই আমাকে ক্লাস ছেড়ে যেতে বললেন ঐ ছেলেদের সঙ্গে। বাইরে বেরিয়ে আমি ভয়ে ভয়ে বললাম: কেন আমাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছেন?

একজন বলল: কোন ভয় নেই, আমরা আছি।

আর একজন বলল: একটা গান গাইতে হবে।

আমি আর্তনাদ করে উঠলাম: ওমা, সেকি! আমি তো গান জানিনা! আর একটি ছেলে ধমক দিয়ে বলল: গান জানোনা মানে! স্কুলে প্রাইজের সময়ে তো তুমিই গান গাও।

সে তো সকলের সঙ্গে স্বর মিলিয়ে। তার জন্যে রিহার্সাল দিতে হয় কত!

তারা বলল: এবারের প্রাইজে যে গানটা গেয়েছিলে, তাই গাইবে।

বললাম: সব লাইনগুলো তো মনে নেই! মাত্র দু-তিনটে লাইন মনে আছে।

ওতেই হবে।

স্কুলের মাঠ পেরিয়ে আমরা কলেজের মাঠে পৌঁছেছিলাম। জিজ্ঞেস করলাম: কলেজে কেউ গান জানেনা?

একজন বলল: যে ছেলেটা জানে, সে আজ আসেনি। উদ্বোধন সঙ্গীত গাইবার জন্যে কাউকে পাওয়া যাচ্ছে না।

আর একজন বলল: তুমি কয়েকটা লাইন গেয়ে দিলেই চলবে। তারপর তো বক্তৃতা। বক্তৃতার লোক আছে।

তারা আমাকে টেনে নিয়ে গিয়ে সোজা স্টেজে তুলে দিল। মনে হল সবাই যেন গানের জন্যেই অপেক্ষা করছিল। একজন ধমক দিয়ে বলল: অনেক দেরি হয়ে গেছে। আরম্ভ কর।

কাজেই আরম্ভ করতে হল। যে গানের প্রথম দুটি লাইন গেয়েছিলাম, তা আজও মনে আছে। আমাদের মাস্টার মশাই এ গানটি শিখিয়েছিলেন প্রাইজের সময়ে গাইবার জন্যে। এ যে রবীন্দ্রনাথের লেখা ব্রহ্মসঙ্গীত তা জানা ছিলনা। আর বয়সের গুণে ভয় ভাবনাও ছিলনা। আমি গাইলাম—

আজি যত তারা তব আকাশে
সবে মোর প্রাণ ভরি প্রকাশে ॥

এর পর কটা লাইন গেয়েছিলাম তা মনে নেই। তারপর ঠেকে গিয়ে অসহায় ভাবে চারিদিকে তাকাতেই হাততালি পড়ে গেল। কারা হাততালি দিল আর কারা হাসল, সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে আমি দৌড়ে পালিয়ে এলাম নিজের ক্লাসে।

এই আমার কলেজে যাবার প্রথম অভিজ্ঞতা।

কিন্তু কলেজের নাম তখন অন্য ছিল—মহারানী ভিক্টোরিয়ার নামে ভিক্টোরিয়া কলেজ। আমরা যখন পড়ি তখনও এই নামই ছিল। কবে যে কলেজের নাম পরিবর্তিত হয়ে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাবিদ্যালয় হয়েছে, তা জানা ছিলনা। কিন্তু দেশের এই অসাধারণ পণ্ডিতের নাম আমি ছেলেবেলাতেই শুনেছিলাম। আমাদের পিতৃতুল্য শিক্ষকদের কাছেই শুনেছি। তিনি নাকি পনের বৎসর এই কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন এবং বিগত শতাব্দীর শেষের দিকে এসেছিলেন এই কলেজের ভার নিয়ে। দশটি বিদেশী ও ভারতীয় ভাষায় তাঁর দখল ছিল। শুধু দর্শনি নয়, নানা শাস্ত্রে তাঁর বিচরণ ছিল সচ্ছন্দ। এই কলেজে অধ্যক্ষ হয়ে আসবার আগেই তাঁর একখানি গ্রন্থ প্রকাশ হয়েছিল। তার নাম A Memoir on the Co efficient of Numbers—A chapter on the theory of Numbers তাঁর লেখা কয়েকখানি বইএর কথা ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়। তিনি লিখেছেন Introduction to Hindu Chemistry, Positive Sciences of the Ancient Hindus, Race, Origin, Positive Back. ground of Hindu Sociology.

আমার আশ্চর্য হবার কারণ আছে। আমি শুনেছিলাম যে তিনি কিছু বলতে আরম্ভ করলে বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে চলে যেতেন, অর্থাৎ মূল কথার খেই হারিয়ে ফেলতেন। এ তাঁর দুর্বলতা নয়। যারা অসাধারণ পণ্ডিত তাঁদের এই রকমই হয়। যাঁরা তাঁর কাছে পড়েছিলেন, সেই গুরুজনদের ধারণা ছিল যে তিনি কিছু লিখতে পারবেন না।

একজন আমাকে একটি মজার কাহিনী বলেছিলেন তাঁর সম্বন্ধে। তিনি ছিলেন তাঁর প্রিয় ছাত্র। একদিন সকালবেলায় তাঁর বাড়িতে গিয়ে দেখলেন যে তিনি একটি দর্জিকে জামার মাপ দিচ্ছেন। শুনেছি যে তিনিও রবীন্দ্রনাথের মতো ঢিলেঢালা পোষাক পড়তে অভ্যস্ত ছিলেন। শীতের সময়ে গরম কাপড়ের যে পোষাকটি পড়তেন,

তা একটি আলখাল্লার মতো ঢিলে ঢালা—গলা থেকে পা পর্যন্ত ঝোলা, চওড়া হাত। দিশী আচকান নয়, আবার বিদেশী ওভারকোটও নয়। এ পোষাকে আমরা রবীন্দ্রনাথের ছবি দেখেছি। তিনিও নাকি এই রকমেরই পোষাক পরতেন। তাই দর্জিকে বলছিলেন, দেখ বাবা, আমি একটু ঢিলেঢালা পোষাক পছন্দ করি, কোনদিকে যেন ছোট না হয়।

তারপর এক থান গরম কাপড় এনে তাকে দিয়ে বললেন : এই নাও কাপড়।

দর্জি কাপড় দেখে জিজ্ঞেস করল : কটা তৈরি করতে হবে ?

তিনি চমকে উঠে বললেন : কটা কি হে! একটাই কর।

দর্জি বিনীত ভাবে বলল : গোটা তিনেক হয়ে যাবে।

তিনি বলে উঠলেন : না হে না, দু তিনটে করতে গিয়ে ছোট করে ফেলবে। তুমি মাপমতো একটাই কর।

দর্জি তাঁর ছাত্রের দিকে তাকাল অসহায় ভাবে। তাঁর সেই ছাত্র বললেন : একটাই কর। আর কাপড় যদি বাঁচে তাহলে তা ফেরৎ দিয়ে যেও।

তিনি খুশী হয়ে বললেন : সেই ভাল।

তাই আমার গুরুজনেরা বলেছিলেন, পাণ্ডিত্য এই রকমেরই। বেশি পণ্ডিত হলে সংসারে মানুষ অনভিজ্ঞ হন এই রকম। কিন্তু সবাই কি হন ? শৈশবেই পিতাকে হারিয়ে কঠিন দারিদ্র্যের মধ্যেই তো তিনি এত বড় পণ্ডিত হতে পেরেছিলেন। তিনি কি কোন বিষয়ে অনভিজ্ঞ ছিলেন ?

কোচবিহারে আমার কর্মচ্যুতির প্রেক্ষাপটঃ
গণআন্দোলন ও ফলশ্রুতি

দুর্গাকিংকর ভট্টাচার্য

আজকের কুচবিহার পশ্চিমবঙ্গের সুপরিণত গণতান্ত্রিক চেতনায় সমুন্নত—বামপন্থী শক্তির একটি দুর্জয় ঘাঁটি। ১৯৫২ সালে নির্বাচনের প্রাক্কালে কয়েকটি তরুণতরুণী পুলিশের গুলিতে নির্মমভাবে নিহত হবার পরও যে সংগঠন সবক'টি আসনে বিজয়ী হয়েছিল, আজ সে সংগঠন প্রায় নিশ্চিহ্ন। এই বাতাবরণে বর্তমান প্রজন্ম সুদূর অতীতে আমাদের শৈশব ও তারুণ্যের যুগে এই দেশীয় রাজ্যটি রাজনীতিগত, অর্থনীতিগত ও সংস্কৃতিগত ভাবে কী রোমহর্ষক ভাবে অনগ্রসর ছিল এবং এখনকার রাজপরিবারের চরম শোষণ ব্রিটিশ ভারতের ঔপনিবেশিক শোষণের চেয়েও কত বেশী ভয়াবহ ছিল, তা বোধ হয় কল্পনাও করতে পারবে না—কারণ তারা পশ্চিমবঙ্গের একটি অংগ জেলাতেই জন্মগ্রহণ করেছে ও এখানকার গণতান্ত্রিক আবহাওয়াতে তাদের মানসিকতা লালিত হচ্ছে—একটি কুখ্যাত দেশীয় রাজ্যের শ্বাসরোধকারী পরিবেশে নয়।

সত্তর-উত্তর স্মৃতি রোমন্থণের মধ্যে অনেক ত্রুটি ও অসংগতি হয়তো স্বাভাবিক সুদীর্ঘকালের ব্যবধানে ঘটনা পরম্পরার বিন্যাসেও হয়তো অনেক প্রমোদ থেকে যাবে। তবুও কুচবিহারের প্রথম উল্লেখ্য গণতান্ত্রিক আন্দোলন সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা দেবার চেষ্টা করছি। বলা চলে, আমি কুচবিহারে জন্মেছি ও সেখানকার আলো বাতাসেই লালিত-পালিত হয়েছি। জীবনের প্রথম আঠারোটি বছর কেটেছে কুচবিহারে। আঠারো বছর বয়েসে অর্থাৎ সাবালকত্ব অর্জনের পর কলকাতায় ছাত্রজীবন শুরু হ'ল। জীবনের সেই যেন "হঠাৎ-আলোর চরণধ্বনি বেজে উঠলো"। সংগ্রাম-উত্তাল ব্রিটিশ ভারতের ছাত্রবন্ধুদের বহু-আন্দোলনের সক্রিয় অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ রাজনৈতিক চেতনাও দু' একজন ছাত্রবৎসল অধ্যাপকের (প্রয়াত সুশোভন সরকার) ব্যক্তিত্ব, দৃঢ় সান্নিধ্যের প্রসাদে নতুন এক রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হলাম—শ্রেণী বৈষম্য ও শ্রেণী সংগ্রামের আলোকে সমস্ত জিনিসের মূল্যায়ন করতে শিখলাম। ১৯৩৩-৩৮ এই পাঁচ বছরে মাঝে মাঝে কুচবিহারে এসেছি এবং নবলব্ধ রাজনৈতিক বোধির আলোকে পাট-সুপারী-ধান-তামাক সমৃদ্ধ কুচবিহারের কৃষকদের কৌপীন-সর্বস্বতার রাজনৈতিক তাৎপর্য অনুধাবন করতে শিখেছি এবং এদের মূল শত্রু যে কুচবিহারের রাজপ্রাসাদ সে সম্পর্কে সচেতন হয়েছি।

১৯৩৮ এ জীবিকার সন্ধানে কলকাতা ছেড়ে আসতে হ'ল এবং ১৯৩৮-৪৩ এক নীরবিচ্ছিন্ন সুকঠোর জীবন

সংগ্রামের ইতিহাস। দিগন্তে তখন যুদ্ধ-মেঘের ভ্রূকুটি, প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম তিন-ত্রিক্ষে-নয়ের হারে বাড়ছে— অবসর প্রাপ্ত পিতার পেন্‌সনের মুষ্টিভিক্ষা এবং নিজের তু-ডিজিটের মাসিক পারিশ্রমিক এই সম্বল নিয়েই সংসার-তরণীর হাল ধরলাম। উদয়াস্ত গৃহশিক্ষকতার পরিশ্রম অর্থাৎ জীবিকার তাড়নায় একটি সংগ্রামী আদর্শ উদ্বুদ্ধ ভবিষ্যৎ জীবনের স্বপ্ন হ'ল রক্তাক্ত, নিহত। এই অবস্থাতেও কাশিম বাজারের নন্দী-রাজপরিবারের আমার প্রতি একটি ঘোর অবিচার ও বৈষম্য-মূলক আচরণের প্রতিবাদে পদত্যাগ ক'রে কিছুদিন বেকার জীবন যাপনের বিড়ম্বনাও ভোগ করতে হয়েছিল।

ঠিক ৩০ বছর বয়সে প্রায় ছ'বছরের ব্যবধানে কুচবিহার কলেজে অধ্যাপকরূপে কুচবিহারে পুনঃ প্রবেশের সুযোগ পেলাম। আর ঠিক তু'বছর পরেই ১৯৪৬ এর আগষ্টে এমন একটি ঘটনা ঘটলো যা আমার কয়েক বছরের বর্ণহীন ঘটনাহীন জীবনকে মূলশুদ্ধ নাড়া দিল। কৈশোর হতেই কুচবিহার প্রশাসনের বিরুদ্ধে ছিল আমার প্রচণ্ডতম বিদ্বেষ ও ক্ষোভ। ১৯৪৬ এর ৮ই আগষ্টের ঘটনাটিকে কেন্দ্র করেই কুচবিহার প্রশাসনের বিরুদ্ধে আমার আকিশোর লালিত ঘৃণা ও ক্ষোভ বিস্ফোরণের রূপ নিল আর বোধ হয় এই গণমাধ্যমেই কোচবিহারে প্রথম উল্লেখযোগ্য গণআন্দোলনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হল।

সেদিনের সেই ঘটনাটি আজও আমার স্মৃতির পটে উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত হয়ে রয়েছে, চল্লিশ বছরের স্থূল অবলেপ তাঁকে বিন্দুমাত্র বিবর্ণ করতে পারেনি। আমাদেরই একজন প্রাক্তন সহপাঠী মনোরঞ্জন মজুমদার কলেজ-ছাত্রাবাসের সম্মুখের রাস্তা দিয়ে সাইকেলে আসছিল—এমন সময় একটি সাইকেলে আরোহী কুচবিহারের তুই জওয়ান তাকে চাপা দেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে সাইকেল থেকে নেমে তাকে নির্মমভাবে প্রহার করতে থাকে। অপরাধটা যেন তারই। প্রত্যক্ষদর্শী ছাত্রাবাসের আবাসিকেরা স্বভাবতই একটি নিরীহ ও নিরপরাধ ভদ্রলোকের প্রতি এই বর্বরোচিত আচরণে ক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত হয়ে ওঠে এবং ঘটনাস্থলে এসে তুটিকে উত্তম মধ্যম দিয়ে সাইকেলটিকে টুকরো টুকরো করে দেয়। ঐদিন বিকেলেই দেখা দেয় এর বীভৎস প্রতিক্রিয়া। কুচবিহারের সেনাবাহিনীর একটি অংশ পূর্ণেন্দু ও নবীরের নেতৃত্বে কলেজে প্রবেশ ক'রে ছাত্র-ছাত্রী, অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকদের নির্বিচারে প্রহার করে এবং পরে সেই সেনাবাহিনী ছাত্রাবাসে ঢুকে ছাত্রদের প্রহার করে ও কয়েকজনকে দ্বিতল হতে নীচে নিক্ষেপ করে। কলেজের তখন শেষ ঘণ্টা; সুতরাং উপযুক্ত প্রতিরোধের পক্ষে পর্যাপ্ত ছাত্রসংখ্যা উপস্থিত ছিল না।

কুচবিহারের জনসাধারণ সুসংহতভাবে এই অমানবিক আচরণের যোগ্য জবাব দিয়েছিল। সেদিন কুচবিহারের আদিম অধিবাসীদেরও উল্লেখ্য অংশ-যাদের অচলা রাজভক্তি রাজ বাহাতুর রাস্তা দিয়ে যাওয়ার পর তাঁর পাতুকাধুলিতে গড়াগড়ি দিতে শিখিয়েছিল—অপরাধীদের ধিক্কার জানানোর জন্য আহুত সভায় জনসমুদ্রের মতো এসে সামিল হয়েছিল। জীবনে আমি সেই প্রথম এক বিশালতম সমাবেশে বক্তৃতা দিতে উঠেছিলাম। বক্তা একমাত্র আমি। ভাষণের মাধ্যম ইংরেজী। সেই সভায় কুচবিহারের মহারাজার তরফ থেকে উপস্থিত ছিলেন গৃহমন্ত্রী রাজেন্দ্রসিং।

মনে পড়ে আমি যখন তুমুল করতালির মধ্যে ঐ ঘাতকদের "Pantered brutes of the Cooch-Behar state Force" বলে উল্লেখ করেছিলাম রাজেন্দ্র সিং-এর গৌর মুখমণ্ডল ক্রোধে রক্তিম হয়ে উঠেছিল। কারণ কুচবিহারের রাজাই জওয়ান বাহিনীর সর্বাধিনায়ক। সেদিন কুচবিহারের প্রতিটি মানুষের মনে আক্রমণকারীদের প্রতি ঘৃণা এবং আক্রান্তদের প্রতি অপরিসীম সহানুভূতির স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ দেখা গিয়েছিল। সমস্ত রাস্তাই গিয়ে মিশেছিল হাসপাতালে। ফুল, ফল অর্থ নিয়ে উদ্বেগে আকুল মানুষের দিনরাত্রি পথচলা, এমন কী দীন-দরিদ্র রিক্সা চালকেরা পর্যন্ত হাসপাতালগামী যাত্রীদের নিকট হতে ভাড়া নিতে অস্বীকৃতি জানাতো।

রাজ্য কর্তৃপক্ষ প্রথমে আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল এই গণ-বিক্ষোভকে দমন করতে এবং ধামাচাপা দিতে—কিন্তু শেষ পর্যন্ত আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হ'ল এবং Tribunal এর মাধ্যমে অপরাধীদের বিচারের ব্যবস্থাও তাঁদের করতে হ'ল। অবশ্য রাজ্যের রাজস্ব হতেই এদের ডিফিন্সের আয়োজন করা হয়েছিল। কিন্তু শেষ রক্ষা হল না—পূর্ণেন্দু-নবী সমেত অপরাধীদের বিভিন্ন মেয়াদের কারাবাসের সাজা হ'ল। কুচবিহারের জীবনে চরম প্রতিক্রিয়াশীল প্রশাসনের বিরুদ্ধে জনগণের এই-ই প্রথম বিজয় আর এই অচিন্তিতপূর্ব গণ জাগরণই এক বৎসরের মধ্যে আর একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে বৃহত্তর এক গণঅভ্যুত্থানের রূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল। শাসককুল এই পরাভবের গ্লানি জীর্ণ করতে পারলেন না এবং তাঁদের ধারণা হ'ল ভাটিয়ারাই মূলতঃ এর জন্য দায়ী। এদের শিক্ষা দেবার জন্য কয়েকজন মন্ত্রী ও রাজনৈতিক চেতনা বর্জিত আদিম অধিবাসীদের নিয়ে হায়দ্রাবাদের 'রাজকার' সংগঠনের অনুকরণে একটি প্রতিক্রিয়াশীল সংগঠন গড়ে তুললেন—নামকরণ হ'ল 'হিত সাধনী সভা।' আদি অধিবাসীদের প্ররোচিত করে তাদের সমস্ত রোষ ভাটিয়াদের বিরুদ্ধে পরিচালিত করাই ছিল এর মুখ্য উদ্দেশ্য।

আজও মাঝে মাঝে মনশ্চক্ষে দেখতে পাই 'হিতসাধনী সভার'' প্রথম অধিবেশনের ছবিটি। উদ্বোধনী সংগীত—'কুচবিহারী ভাইরে তোর পরনত কেনে ত্যানা'—ইংগিতটা সুস্পষ্ট কুচবিহারী ভাইদের, পরনে "ত্যানা" অর্থাৎ ছিন্ন বস্ত্রের জন্য ভাটিয়ারাই দায়ী। গায়ক আব্বাস উদ্দিন (সুবিখ্যাত পল্লীগীতি গায়ক—তখন কুচবিহারের বাসিন্দা) আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে গানটি গেয়ে মাইকের ওপরই কয়েক ফোঁটা অশ্রু নিক্ষেপ করলেন। এরপর একটি মজার ঘটনাও ঘটেছিল। উদ্বোধনী সংগীত কোন করতালির দ্বারা অভিনন্দিত হ'ল না দেখে একজন উদ্যোক্তা মঞ্চ থেকেই নির্দেশ দিলেন "হাততালি দেওয়া যায়" আর সঙ্গে সঙ্গে দিগ্বিদিক্ কাঁপিয়ে প্রচণ্ড করতালি। এর পরই সদ্য প্রয়াত ত্রিপুরাধিপতির জন্য একটি শোক প্রস্তাব পঠিত ও গৃহীত হ'ল। আর সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড করতালি। বিব্রত ও হতভম্ব সেই উদ্যোক্তাটি তারস্বরে ঘোষণা করলেন "হাততালি দেওয়া যায় না, হাততালি দেওয়া যায় না"। যুগ যুগ ধ'রে শোষিত, সম্পূর্ণভাবে রাজনৈতিক জ্ঞান বর্জিত আদি অধিবাসীদের এই কৌতুককর অজ্ঞতার জন্য কাকে দায়ী করবো ?

এর পরই "হিতসাধনী" বলে বলীয়ান কর্তৃপক্ষের কলেজই হ'ল আক্রমণের প্রধানতম লক্ষ্য। বাইরের

গণতান্ত্রিক চেতনার অনুপ্রবেশকে প্রতিরোধ করতে বহিরাগত ছাত্রদের মাসিক ট্যুশন ফি বাড়ান হ'ল—জনসাধারণের অর্থে নির্মিত ছাত্রাবাসের ওপর নতুন ক'রে চার্জ ধার্য হ'ল এবং সবচেয়ে যা' আপত্তিকর—বাইরের ছেলেদের ভর্তির পূর্বে "আমি কোন আন্দোলনে অংশ নেব না" এই মর্মে মুচলেকা দেওয়া বাধ্যতামূলক করা হ'ল। জণগণের মৌলিক অধিকারগুলো আরও নির্মমভাবে পদদলিত হতে লাগলো। এই অসহনীয় পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য আমাকে সম্পাদক করে গঠিত হল "Civil Liberties Committee" আত্মপ্রকাশ করল আরও দুটি গণসংগঠন "Cooch-Behar State Employees' Association," 'Cooch-Behar Bank Employees' Association'—যেগুলির সাথেও আমি সক্রিয় ভাবে জড়িত ছিলাম।

নাগরিক অধিকার সমিতি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো ১৯৪৭-এর ১৫ই আগষ্ট "নাগরিক অধিকার দিবস" হিসেবে উদ্‌যাপিত হবে। কিন্তু রাজ দরবারের অনুমতি প্রথমে পাওয়া গেল না। কিন্তু প্রবল জনমতের চাপে কর্তৃপক্ষ নতিস্বীকারে বাধ্য হ'ল এবং সে সভায় সভাপতিত্ব করেছিলাম আমি। এরপরই প্রতিহিংসা গ্রহণ করবার মানসিকতা নিয়েই ২৩শে আগষ্ট আমাকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হ'ল। জনস্মৃতি খুবই ক্ষীণায়ু। সুতরাং সেদিন কুচবিহারে যে সর্বব্যাপী আন্দোলন প্রতিটি রাজনৈতিক দল ও ছাত্রসংগঠনের সক্রিয় অংশগ্রহণ উত্তাল হয়ে উঠেছিল ও পশ্চিম-বঙ্গের প্রতিটি প্রান্তে যার তরঙ্গ আছড়ে পড়েছিল আজ তা' বিস্মৃতপ্রায় অতীতের একটি ধুলিবিবর্ণ পৃষ্ঠামাত্র। আমার পুনর্নিয়োগের দাবী এর কেন্দ্রমূলে থাকলেও এ শুধুমাত্র ব্যক্তিবিশেষের পুনর্বহালের আন্দোলন ছিল না—অবিচার, অত্যাচার অনাচারের বিরুদ্ধে এ ছিল জনগণের পুঞ্জীভূত আক্রোশের আগ্নেয় প্রতিবাদ। সেদিন কোচবিহারে কমিউনিষ্ট, ফরোয়ার্ডব্লক বা কংগ্রেস কোনোটারই আইনগত কোন সংগঠন ছিল না। কংগ্রেস এর কোন কার্যকলাপই ছিল না। পরবর্তীকালে সেই কুখ্যাত "হিতসাধনী সভা" ই কংগ্রেসে পরিণত হয় এবং প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী আনসার উদ্দীন আহমেদ (যিনি যথাসময়ে পাকিস্তানে আশ্রয় নিয়েছিলেন) কোচবিহারে কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি হন। আর কোনো গণ সংগঠন না থাকলেও ফরোয়ার্ডব্লকের ছাত্রসংগঠন শক্তিশালী ছিল যার নেতৃত্ব দিত হারু কমল (বর্তমান পঃ বঃ মন্ত্রীসভার সদস্য) নরেশ বসু মহাশয়ের দুই পুত্র অমল, বিমল, দুর্গেশ, অপরাজিতা প্রমুখ তখন ছিল এই রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব। কমিউনিষ্ট পার্টিকে কাজ করতে হতো 'People's Book stall' নামে একটি ছোট বইয়ের দোকানের সাইন বোর্ড এর অন্তরালে। সেই সময় ব্যক্তিত্ব যুক্ত ছাত্রনেতা হিসাবে চিহ্নিত ছিলেন শিবেন চৌধুরী (বর্তমান বিধান সভার সদস্য) ও তুফানগঞ্জের উল্লেখযোগ্য নেতা ছিল জীবন দে (প্রাক্তন এম, এল, এ) '৪৭ সাল পর্যন্ত রবি বা বীরেন দে সরকারের (বর্তমানে সি, পি, এম এর জেলা সম্পাদক) কুচবিহারে প্রবেশ ছিল নিষিদ্ধ। কমিউনিষ্ট পার্টিকে সতর্ক গোপনীয়তার পরিবেশে কাজ করতে হলেও **State Employee's Association, Bank Employees' Association** প্রভৃতি গণসংগঠনগুলির উপর রাজনৈতিক প্রভাবই ছিল সবচেয়ে বেশী। কোচবিহারের সমস্ত রাজনৈতিক দলের সহযোগিতায় কলেজ ও নির্যাতিত অধ্যাপকের প্রসঙ্গটি ছাড়িয়ে রাজ্যের প্রতিটি প্রান্তে প্রসারিত হল এক অভূতপূর্ব গণবিক্ষোভ। হাজার হাজার পোষ্টারে ছেয়ে গেল প্রতিটি বাড়ীর দেয়াল, গাছের

কাণ্ড—'নাগরিক অধিকার চাই' 'সমস্ত বন্দীর মুক্তি চাই' '২৪ ঘণ্টার নোটিশে কালাকানুন ছিঁড়ে ফেলো, পুড়িয়ে ফেলো, কৃষককে শোষণ করা বন্ধ কর'। কোচবিহারের পঃ বঃ ভুক্তি চাই। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে শীর্ষস্থানীয় নেতারা আন্দোলনকে জোরদার করার জন্য কোচবিহারে এলেন।

নিখিল ভারত রাজনৈতিক বন্দী মুক্তির সমিতির সম্পাদক হরিদাস মিত্র—সমস্ত বন্দীদের মুক্তির দাবী জানালেন ও প্রধান মন্ত্রী জহরলাল নেহেরু ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী সর্দার প্যাটেলকে অবিলম্বে হস্তক্ষেপের অনুরোধ পাঠালেন।

এই গণ-আন্দোলন পরিপূর্ণভাবে সফল হয়নি, কারণ মূল দাবীই ছিল অপূর্ণ। আমাকে কর্পদকশূন্য অবস্থায় ছাত্রদের বিদায় সংবর্ধনা অর্ঘেই সপরিবারে তোরষা ছেড়ে আসতে হয়েছিল মহানন্দার তীরে। কিন্তু সে তো অন্য এক কাহিনী—বারান্তরে প্রকাশ্য। তবু কোচবিহারের এই প্রথম গণ আন্দোলনই যে পরিবর্তীকালে অনেক বৃহত্তর ও সফল আন্দোলনের একটি সুদৃঢ় বনিয়াদ রূপে কাজ করেছে, কোচবিহারের পঃ বঙ্গ ভুক্তির ত্বরান্বিত ক'রছে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির অবলুপ্তির ও প্রগতিশীল শক্তির অভ্যুদয়ের মূলে বিরাট ও অনস্বীকার্য অবদান জুগিয়েছে—এবিষয়ে কোনো মহলেই বোধ হয় বিন্দু মাত্র সন্দেহ নেই।

আমার ভিক্টোরিয়া কলেজ

পুলকেশ দে সরকার

একটা মাঠের ব্যবধান মাত্র। হ্যাঁ, খেলার মাঠ; উত্তর দক্ষিণে স্থায়ী গোলপোষ্ট। ঐ মাঠটা পার হলেই কলেজ। আমাদের ফার্ষ্ট ক্লাশ থেকে পরিষ্কার দেখা যায়। ভিক্টোরিয়া কলেজ। আমাদের ক্লাশের প্রায়-লাগোয়া পাকুড় গাছটা দৃষ্টিকে বাধা দেয় না। রোজ দেখি। ঐ কলেজ, ঐ মাঠ; মাঠ পেরোলেই কলেজ, কিন্তু ওটা বা ঐটুকু ব্যবধান ঘোচাতেই ন'টা বছর কেটে গেল, নাইন্থ ক্লাশ থেকে। সেখান থেকে এত পরিষ্কার দেখা যেতনা, এই ফার্ষ্ট ক্লাশে বসে যেমন দেখা যায়।

জেনকিন্স স্কুলে এতটা বছর অপেক্ষা করেছি ঐ ভিক্টোরিয়া কলেজে পৌছোব বলে। ২৫ সাল পর্যন্ত, পার হ'তে পারব কিনা তার পরীক্ষা হ'ল ১৯২৫ সালে, আশ্চর্য, ঐ ভিক্টোরিয়া কলেজেই, আমবায়ালকাল কর্ডটা যেন এখানেই ছিন্ন করা হবে।

তখন পরীক্ষার ফল কলকাতার বিশ্ববিদ্যালয় ভবনের দেওয়ালে টাঙিয়ে দে'য়া হ'ত (যাকে ওয়াল আপ করা বলে)। আগের দিন দেখে গিয়ে মেজদা চিঠি লিখলেন, দার্জিলিং মেল, দলসিংপাড়া প্যাসেঞ্জার হয়ে পরদিনই সকালবেলা চিঠিটি পৌছে দিল। এখনকার দিনে অবিশ্বাস্য। ডাক বিভাগের এতই উন্নতি হয়েছে।

একটি পোষ্টকার্ড বয়ে নিয়ে এল আমার ও আমার দাদার পাশের খবর। এখন ঐ মাঠটুকু পার হ'তে কোন বাধাই রইল না। ফার্ষ্ট ডিভিসানে উতরেছি বলে নয়, ভিক্টোরিয়া কলেজে জেনকিন্স স্কুলের পাশ-করা ছাত্রদের স্থান সুনিশ্চিত থাকত।

শুনেছি, ১৯২১ এ যখন সারাভারতে অসহযোগ আন্দোলন হয়েছিল তখন কিছু বাইরের ছেলে এখানেও স্কুল-কলেজ বর্জনের ধোঁয়া দিতে চেষ্টা করেছিল। মহারাজা তাদের উদ্দেশে বলেন, এই স্কুল, এই কলেজ আমার রাজ্যের প্রজাপুঞ্জের ছেলেদের জন্যে, বাইরের ছেলেদের পড়তে দি জায়গা থাকলে, কিন্তু গোলমাল করলে বা তারা অসুবিধে বোধ করলে রাজ্য ছেড়ে চলে যেতে পারে।

গোলমালটা সেখানেই চুকে যায়। কেননা, এত সস্তায় বোর্ডিংএ থেকে কলেজে পড়া আর কোথায় হবে?

মহারাজা কিন্তু অসহযোগ আন্দোলনের মূল কর্মসূচীর বিরোধী ছিলেন না; তিনি তাঁত বা চরকা তৈরির জন্যে আর্টিজান স্কুলে সুযোগ সম্প্রসারিত করে দিয়েছিলেন; কিছুদিন ঘর ঘর চরকাও চলেছে। কাজী নজরুল ইসলাম এসেছিলেন কোচবিহারে, তিনি বরং কিছু গোঁড়া মুসলমান ছাত্র-জনতার হাতে লাঞ্ছিত হয়েছিলেন তাঁর

ধর্মনিরপেক্ষ স্বদেশিয়ানার জন্যে, রাজ-লাঞ্ছিত হন নি। আমি নিজে ফোর্থ ক্লাশে মাথায় গান্ধী টুপি মাথায় দিয়ে বসেছি, দৃষ্টি আকর্ষণ করলেও কেউ কিছু বলেন নি, উৎসাহের প্রাবল্য কমে গেলে নিজেই বাদ দিয়েছিলাম। আমি আসলে গান্ধীবাদী ছিলাম না, বাঙলার বিপ্লবপন্থীদের দিকে ঝুঁকেছিলাম। আমাদের মহারাজা বিপ্লববাদী সাহিত্য সম্পর্কে রুষ্ট ছিলেন না, নিষিদ্ধও করেন নি ঐ সাহিত্য। সুতরাং, আমরা ঐ জাতীয় পুস্তক পাঠে বা তদনুরূপ মানসিকতা পরিপোষণে বাধা পাইনি। কোচবিহার সাহিত্যসভায় এমন অনেক বই ছিল; সে সব পড়া শেষ করেছিলাম। বোর্ডিংয়ে অবস্থানকারী বিপ্লবী আড়কাঠির পাল্লায়ও পড়েছিলাম, নানা বইয়ের মধ্যে সিডিশান কমিটির রিপোর্টও পেয়েছি এবং ঐ গুপ্ত আন্দোলনের আকর্ষণও দুর্নিবার হয়ে গিয়েছিল আমার স্কুল-কলেজ পাঠ্যজীবনে।

এবং এইটেই আমার কাল হয়েছিল।

অনায়াসেই ঐ মাঠের ব্যবধানটুকু পার হয়ে ভিক্টোরিয়া কলেজের ফার্ষ্ট ইয়ারে ভর্তি হয়েছিলাম। আই-এ, অর্থাৎ আর্টস, কিন্তু কম্বিনেশনের যথেষ্ট অবকাশ না থাকায় সায়েন্স স্ট্রীমের কেমিষ্ট্রি নিয়েছিলাম। প্রথম কারণ, অঙ্কে ভয় জন্মে গিয়েছিল; আমার বন্ধুরা সব বিজ্ঞানে গেল, আমি সাহস পেলাম না। আমার হিষ্ট্রি টীচার (অমৃতলাল গুপ্ত) ও বাংলা টীচার (অশ্রুমান দাশগুপ্ত) আমার আসল ব্যাপারটা জানতেন না, তাই ইতিহাসের শিক্ষক বললেন, তুমি ইতিহাস নিয়ে এম-এ পড়বে, বাংলা শিক্ষক বললেন, বাংলা নিয়ে এম-এ পড়ো।

কাউকেই কিছু বললাম না। গুপ্ত আন্দোলনে জড়িয়ে গেছি। আমার মতলব গুপ্তই থেকে গেল। সিভিকস ছিল না, সংস্কৃত ছিল; কিন্তু যদিও আমার অপসানাল ছিল সংস্কৃত, কোন একটা মতলবে কেমিষ্ট্রি নিয়েছিলাম। কাজে লাগেনি, লাগাতে পারি নি।

কেননা, কোচবিহার ভিক্টোরিয়া কলেজে আমার 'কলেজ জীবন' ছিল খুবই সংক্ষিপ্ত। একটা মাত্র পরীক্ষা দিয়েছিলাম। তাতেই সেকেণ্ড ইয়ারে নাম উঠেছিল, কিন্তু তদ্দিনে আমরা দুটি ভাই-ই বিপ্লববাদের আটলান্টিকে ডুবে গেছলাম। বহু পরে, কারাজীবন বন্দীজীবন পার হয়ে সংসারী হবার পর এক্সটার্নাল ছাত্র হিসেবে আই-এ/বি-এ পাশ করি। স্কুলে আমাদের গ্রুপটা ছিল সত্যিই অসাধারণ; কে কাকে ডিঙোবে এরকম একটা সংশয় সবার মনেই থাকত; নাইনথ ক্লাশে প্রাইজ-পাওয়া ছেলে আমি, গোলে হরিবোলে আমিও ভালো ছেলে গণ্য হতাম, কিন্তু সেকেণ্ড ক্লাসে এক উইকলি পরীক্ষায় অঙ্কের ফল দেখে আমার চক্ষু তো চড়কগাছ।

আমরা দু'ভাই গোগ্রাসে এক শ্রেণীর বাইরের বই পড়ে গেছি, এতে যে আসল পাঠ্যের কি ভয়াবহ ক্ষতি হচ্ছিল তা ফলেই বোঝা গেল। ডিভিসান ফার্ষ্ট হ'লেও নম্বর তেমন উল্লেখযোগ্য হয়নি অনুমান করতে কষ্ট হয়নি। আমাদের কালে মার্কসীট দেওয়া হ'ত না বা ছিল না। কোচবিহার রাজ্যের গেজেটে যে নামাবলী বেরিয়েছিল তাতে আমার বা দাদার নাম মাঝামাঝি ছিল এবং তাই থেকে অনুমান, ওটি ফল-অনুসারে ছাপা হয়েছিল। একটু মনস্তাপ

হয়েছিল কিন্তু তারও বোধ হয় সময় ছিল না, স্বদেশোদ্ধারের যে-কুমীর ধরেছিল তা ক্রমশই টেনে নিয়ে যাচ্ছিল —পরিণাম সম্বন্ধে ভাববারও সময় ছিলনা।

(দুই)

যথারীতি কলেজের ক্লাশগুলোয় নিয়মিত যাতায়াত চলল। অনিয়ম আমার ধাতে ছিল না ; স্কুলে গুড এটেণ্ডেন্সের জন্যে সারাটা স্কুলে একমাত্র আমিই একটা প্রাইজ পাই। সুতরাং, যদ্দিন ছিলাম কলেজেও আমার নিয়মিত উপস্থিতির কোন হেরফের হয়নি।

আমাদের প্রিন্সিপাল ছিলেন মনোরথধন দে, কলেজেরই উত্তর-পুর্ব কোনে একটা ছোট্ট কোয়ার্টারে সপরিবারে থাকতেন ; এর আগে ছিলেন আমাদেরই পাড়ায়, পাটাকুড়ায়। তিনি পড়াতেন ফিজিক্স। আমি তাঁর ক্লাশ-ছাত্র ছিলাম না। বিজ্ঞানে একমাত্র কেমেস্ট্রি প্রফেসর ফণীভূষণ চ্যাটার্জির ছাত্র ছিলাম। তিনি আবার বোর্ডিংয়ের সুপারিন্টেণ্ডেন্ট। পড়াবার ভঙ্গিটি ছিল আকর্ষণীয় ; গ্যালারির শেষ পঙ্‌ক্তির ছেলেরাও তাঁর উচ্চকণ্ঠ শুনতে পেত। সকলের-শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। অঙ্ক কে পড়াতেন মনে নেই বিজ্ঞানের অন্য বিষয়ের প্রফেসরদের কথাও মনে নেই। আর্টসে আমাদের পড়াতেন শরৎ গুপ্ত, অমূল্য গুপ্ত (ইংরেজী); association of ideas এর কল্যাণে 'লা এলিগ্রো' ও 'ইল পেনসেরোসো' মনে আসত। আমরা সবাইকে প্রফেসর বলে জানতাম ; লেকচারার কেউ ছিলেন কিনা জানতাম না। চুনীলাল মুখার্জি আমাদের ইতিহাস পড়াতেন, অনর্গল বলতে পারতেন না, কি একরকম গলা খাঁকারি দিয়ে থেমে থেমে পড়াতেন। ব্যবসায়ের দিকে ঝোঁক ছিল, একটা বড় দোকান দিয়েছিলেন বড় বাজারে। তাঁর এই দোটানায় আমাদের মন ভরত না। আমরা শিক্ষককে শুধুই শিক্ষকতায় দেখতে অভ্যস্ত ছিলাম। আমাদের লজিক কে পড়াতেন আপাতত মনে পড়ছে না। হ্যাঁ, আমাদের গোড়া থেকেই বলতে গেলে টিউটোরিয়াল ক্লাশ হ'ত। পড়িনি, কিন্তু সংস্কৃতের প্রফেসর ছিলেন নিত্যগোপাল বিদ্যাবিনোদ, পণ্ডিত লোক এবং পণ্ডিতদের কাঠিন্য তাঁর মধ্যে যথেষ্ট পরিমানেই ছিল। আমাদের স্কুল সহপাঠী, একসময়ের ফার্স্ট বয়, ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্যের বাবা।

ইংরেজী প্রফেসরদের মধ্যে P. R. Dhar এর কথা মনে পড়ে, খুব কেতাদুরস্ত। আজ ৮১ বছরে অনেক কথাই মনে নেই। তাই থাক ওসব কষ্ট-কল্পনা অথচ সেই পড়াই পড়লাম, জেলখানা বন্দীশালা পার হয়ে সাংসারিক জীবন যাপন কালে কলকাতার বিদগ্ধ উপচার্য ডঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষের সৌজন্যে External Candidate হিসেবে আই-এ, বি-এ পাশ করি, কেননা, কঠিন বাস্তব চাকুরি জীবনে আমি গ্রাজুয়েট নই জেনে আমার প্রার্থনা নামঞ্জুর হ'ত। স্বাধীনতা সংগ্রামের জীবন আর এ জীবনে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। কিন্তু External Candidate এর কোন কলেজ-জীবন নেই। তাই, আমার প্রথম যৌবনের-কলেজ-জীবন সংক্ষিপ্ত ও অনুল্লেখ্য।

তবু শেষ কথা আমি জেনকিন্স স্কুল ভিক্টোরিয়া কলেজেরই ছাত্র—ও দুটই আমার শিক্ষা মন্দির। যদিও কোচবিহারে আমার পায়ের তলায় মাটি নেই, তবু আমার জন্মস্থান কোচবিহার শহর, তাই নিয়েই আমার গর্ব।

— x —

ভিক্টোরিয়া কলেজের কথা

নলিনীকান্ত দে সরকার

আমার যখন পাঁচ-ছয় বৎসর বয়স হইবে সেই সময়ে আমি জেন্‌কিন্স স্কুলে নবম শ্রেণীতে (বর্তমানে দ্বিতীয় শ্রেণী) ভর্তি হই। ১৮৯৮ ইং সনের প্রচণ্ড ভূমিকম্পে রাজবাড়ীসহ সমস্ত দালান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সেই সময়ে স্কুল কলেজের জন্য অন্য কোনও স্থান না পাওয়ায় মহারাজার অশ্বশালায় এই স্কুল ও কলেজ স্থানান্তরিত হয়। পরলোকগত চন্দ্রমোহন চৌধুরী মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি যে বর্তমানে যেখানে ট্রেজারী অফিস আছে ঐ দালানে স্কুল এবং ভিক্টোরিয়া কলেজ বর্তমান পাব্লিক ওয়ার্কস অফিসের পুরাতন দালানে ছিল। তাহা কতদূর সত্য আমি বলিতে পারিনা।

আমি এই মহারাজার অশ্বশালায় যখন স্কুল কলেজ ছিল সেই সময়ে স্কুলে ভর্তি হই। সেই সময় আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহোদয় কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। শুনিয়াছি ইহার পূর্বে এক ইংরাজ অধ্যক্ষ মিঃ উড ছিলেন।

এই স্কুলে আমি যখন ভর্তি হই তখন প্রখ্যাত উমানাথ রায় মহাশয় প্রধান শিক্ষক ছিলেন। এবং সর্বোপরি কলেজের অধ্যক্ষ স্কুলের কাজকর্মও দেখিতেন।

১৯০৭ ইং সনে জেন্‌কিন্স স্কুল বর্তমানে যেখানে আছে সেই দালানে স্থানান্তরিত হয় এবং ১৯০৯ ইং সনে কলেজ বর্তমানে যেখানে আছে সেই দালানে স্থানান্তরিত হয়।

সময় সময় আচার্য্য ব্রজেন্দ্র নাথ শীল মহাশয় স্কুল পরিদর্শন করিতেন এবং ক্লাস প্রমোশন ইত্যাদি কাজ তত্বাবধান করিতেন। সেই সময় আমরা তাঁহাকে দেখিয়াছি। ইনি কলেজের অধ্যক্ষরূপে ১৯১১ সাল পর্যন্ত ছিলেন। তাহার পর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে চলিয়া যান।

১৯১৩ সালে আমি ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় পাশ করিয়া যখন কলেজে প্রবেশ করি তখন এই কলেজে অধ্যক্ষ হিসাবে ৺উপেন্দ্রনাথ সিংহ মহাশয় ছিলেন। তিনি অবসর গ্রহণ করিলে টি, এস, ভাবনানি নামক প্রখ্যাত ব্যক্তি কিছুদিনের জন্য এই কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। ইহার পর ৺রায় জয়গোপাল ব্যানার্জি মহাশয় অধ্যক্ষরূপে ছিলেন। তাঁহার সময় আমি বি, এ পাস করিয়া চলিয়া আসি।

এই কলেজ প্রথমে অবৈতনিক ছিল এবং সমগ্র উত্তরবঙ্গে একমাত্র রাজশাহী কলেজ ছাড়া আর কোনও কলেজ ছিলনা। তখন পূর্ববঙ্গ আসাম এই সকল স্থান হইতে ছাত্র আসিয়া এইখানে পড়াশুনা করিয়াছে। কলেজে এম, এ পর্যন্ত ক্লাস ছিল। আচার্য্য শীল মহাশয় পড়াইতেন। এই কলেজ অবৈতনিক ছিল বলিয়া ইহার বিশেষ খ্যাতি ছিল। অনেক পরে এই কলেজে মাস-মাহিনা চালু হয়। আমি তিনটাকা হিসাবে মাহিনা দিয়া কলেজে পড়িয়াছি।

——::——

দূর অতীতের স্মৃতি

বাসন্তী রায়

৫৫ বছর আগের কথা। স্মৃতিভারে অনেকটাই ঝাপসা। মার কাছে শুনেছি বিখ্যাত দার্শনিক ব্রজেন শীল ছিলেন ভিক্টোরিয়া কলেজের প্রিন্সিপাল। একটু ভয়ভয়ই করছিল ভর্তি হতে। সহশিক্ষা চালু হয়েছে মাত্র কয়েক বছর হল। মেয়েদের সংখ্যা ছিল নগণ্য। চতুর্থ বর্ষে একজন মাত্র। আর্টসে আমার বিশেষ বিষয় ছিল ইতিহাস, সংস্কৃত ও লজিক। প্রথম বর্ষে এই সেক্সনের প্রায় তিরিশ জনের মধ্যে ছাত্রীর সংখ্যা তিন। আমি, উমা দে এবং আমার মতই কোচবিহারে যার জন্ম সেই স্থানীয় মেয়ে ইলা সেন।

প্রতিদিন ক্লাস হত মেইন বিল্ডিংয়ের পাশে, একপ্রস্থ সারি সারি ঘরে। পাকা, কিন্তু ওপরটায় টিনের ছাউনি। অধ্যাপকদের বসবার ঘরটাও এই এলাকায়। বাংলা ও ইংরাজি ইন্টারমিডিয়েটের অন্য সেক্সনের সঙ্গে একসাথেই হত। আমরা তিনজন সকলের সামনে একটা আলাদা বেঞ্চে বসতাম। আমাদের নিজস্ব কমনরুম ছিল সে সময় মেইন বিল্ডিংয়ের শেষে উত্তর দিকের একটা ঘরে। এখনও মনে পড়ে, কমনরুমে ক্যারম বোর্ড নিয়ে খেলার ফাঁকে নজর থাকত প্রফেসরস রুমের দিকে। সরাসরি দেখা যেত। ওঁরা ক্লাস নিতে বেরোলে আমরাও কমনরুম ছেড়ে ক্লাস ঘরের দিকে পা বাড়াতাম। আবার ক্লাস শেষ হলেই একসঙ্গে ফেরার পালা। এটাই যেন ছিল রোজ নামচা।

ছেলেদের কমনরুমটা ছিল বেশ বড়। ওদের খেলাধূলার সুযোগ ছিল স্বভাবতই বেশী। ক্যারম, ব্যাডমিন্টন, ফুটবল, স্পোর্টস, সরস্বতীপূজা ইত্যাদি নিয়ে ওরা মেতে থাকত। পূজোতেও আমাদের ভূমিকা থাকত নগণ্য। খুব বেশী হলে মেয়েদের একসঙ্গে উপস্থিতিটাই যথেষ্ট মনে করা হত। তবে এ ভাবটা অনেকটাই কেটে গেল আমাদের দ্বিতীয় বর্ষে। নতুন সেসনে ভর্তি হল ৭/৮ জন মেয়ে। 'এতজন'কে নিয়ে কমনরুমটাকেই মনে হত কত ছোট। আমারও তখন বিয়ে হয়ে গেছে। শ্বশুর বাড়ি থেকে পড়াশুনা করার সুযোগ মিলেছিল।

তখন ক্লাসে পড়া ধরা হত। ইংরাজীতেই লেক্‌চার চলত। মাঝে মধ্যে দু-একটা কথা বাংলায় বোঝাতেন। উত্তর দিতে হত ইংরাজীতেই। আমরা তিনজন মেয়ে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করি। কলকাতায় ফিরে উমা দে-ই পরবর্তীকালে গ্র্যাজুয়েট হয়েছিল। তখন ইউনিয়ন কি, আমাদের ধারণাই ছিল না। ছেলে-দের সঙ্গে সরাসরি কোনরকম মেলামেশা ছিল না কলেজের ভেতরে বা বাইরে। তখন ওটাই রেওয়াজ। তবে ছেলেরা একটু আধটু পেছনে যে লাগত না তা নয়। বরং আমাদের নজরে পড়ে এমনভাবে আমাদের উদ্দেশ্য

করে বোর্ডে কিছু লিখেটিখে রাখত। তবে ওদের ঠাট্টার প্রধান টার্গেট ছিল প্রিন্সিপাল মনোরথধন দে-র মেয়ে উমা। ছেলেদের ধারণা ছিল প্রিন্সিপ্যালের মেয়ে বলে বিশেষ ডাঁট ছিল উমার। তাই লেখালেখির মধ্য দিয়ে লাগতও ওর পেছনে বেশী। তবে সবকিছুই শালীনতার গণ্ডীর মধ্যে থেকে।

আমার কলেজ-জীবনের একটি স্মরণীয় দিন—১৯৩৪ সালের ভীষণ বিহারে ভূমিকম্প। কলেজ থেকে ফিরছি—বিকেলের দিকেই বোধ হয়, মাটি কেঁপে উঠল। একটা চাপা সোরগোল। দৌড়ে বাড়ি ফিরলাম। চারদিকে একটা ভয়ভয় ভাব। রাজার হাতিশালা নাকি ভেঙ্গে গেছে। গুজব, হাতি বেরিয়ে সব তছনছ করছে। পরে দেখেছিলাম কলেজ বিল্ডিংয়ে বেশ কয়েকটা লম্বা ফাটল।

"শিক্ষাকে দেয়াল দিয়া ঘিরিয়া, গেট দিয়া রুদ্ধ করিয়া, দারোয়ান দিয়া পাহারা বসাইয়া, শাস্তি দ্বারা কন্টকাকিত করিয়া, ঘন্টা দ্বারা তাড়া দিয়া, মানব জীবনের প্রারম্ভে এ কী নিরানন্দের সৃষ্টি করা হইয়াছে! ——হরিন বাড়ির প্রাচীর ভাঙ্গিয়া ফেলো, মাতৃ গর্ভের দশমাসে পন্ডিত হইয়া ওঠে নাই বলিয়া শিশুদের প্রতি সশ্রম কারাদন্ডের বিধান করিও না— তাহাদিগকে দয়া কর·····।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্মৃতির টুকরো

চারুচন্দ্র রায়

ম্যাট্রিকুলেশান পাশ করে কলেজে ঢুকলাম ইংরাজী ১৯৩১ সনে। কলেজ বলতে অবশ্যই ভিক্টোরিয়া কলেজ- যে কলেজে তখন বাংলাদেশের ত বটেই সারা আসামের ছাত্র এসে ভিড় করত। যদিও তখন রংপুরে আর রাজসাহীতে কলেজ ছিল তবুও যে অভিভাবকেরা চাইতেন যে তাঁদের ছেলেরা রাজনীতির সংশ্রবের বাইরে থেকে সত্যিকারের লেখা পড়া শিখুক, তাঁরা ছেলেদের পাঠাতেন ভিক্টোরিয়া কলেজে। আর আসামে বিশেষ করে ব্রহ্মপুত্রের উত্তর তীরে তখন 'ত' কলেজই ছিল না। তাই কলেজ হোস্টেলের অধিকাংশ আবাসিকই ছিলেন আসামের ছাত্র। সে সময় ছাত্রদের পোষাক ছিল ধুতি আর সার্ট অথবা ধুতি আর পাঞ্জাবী। আসামের ছাত্ররা প্রায় সবাই মালকোঁচা দিয়ে কাপড় পড়তেন—কিন্তু এই কাপড় পরার একটা বৈশিষ্ট্য ছিল। এ'রা কাপড়ে সামনের দিকে একটা ভাঁজ দিতেন আর কাছা এবং কোঁচা পেছনে গুঁজে তার একটা প্রান্ত সামনের দিকে ঘুরিয়ে এনে গুঁজতেন। এই কাপড় পরার ধরণ থেকেই এ'রা যে আসামের ছাত্র তা পরিষ্কার বোঝা যেত। আমরাও যে কেউ কেউ তাঁদের নকল করার চেষ্টা করিনি এমন নয়, তবে নকলটা আসলের মত হ'ত না।

শহরের জনসংখ্যা ১৪/১৫ হাজারের মত। লাল সুরকীর সোজা সোজা রাস্তা উত্তর থেকে দক্ষিণে এবং পূব থেকে পশ্চিমে পরস্পরকে প্রায় সমকোণে ছেদ করে গেছে। রাস্তার মোড়ে মোড়ে তখনও কেরোসিনের বাতি জ্বলে। যান বাহন বলতে ঘোড়াগাড়ী—। ট্রেনের সময় (সকাল একবার আর বিকেলে একবার) যেগুলি যাত্রী নিয়ে যাতায়াত করে। সারাদিনে হঠাৎ ক্বচিৎ দু' একটিকে দেখা যায়। মোটর বলতে রাজবাড়ীর গাড়ী—মহারাজা রাজ্যে থাকলে দিনে দুই একবার দেখা যায়, আর শহরের ধনী জোতদারদের দুই একটি গাড়ী—যা খুবই দুর্লভ দর্শন। অবশ্য সাইকেল ছিল—যার আরোহীরা সন্তর্পণে পথচারীদের বাঁচিয়ে চলতেন। রাস্তার নাম ছিল—প্রধানতঃ কাগজ-কলমে-ঠিকানা ছিল পাড়ার নামে। শহরের মধ্যবিত্তরা প্রায় প্রত্যেকেই প্রত্যেককে চিনতেন। রাজনীতি নিষিদ্ধ বিষয় ছিল-অতি সঙ্গোপনে অবশ্য সীমিত চর্চা হ'ত। যেমন শরৎ চন্দ্রের 'পথের দাবী' তখন নিষিদ্ধ বই—প্রথমে যখন পড়ি, তখন ছাপানো বই পাইনি বহু কষ্টে হাতে লেখা একটি নকল জোগার করেছিলাম।

সে সময় কোচবিহার শহরে মিষ্টির দোকান ছিল তিনটি। তার কোনোটাতেই বসে খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল না—আর দোকানে বসে খাওয়ার রেওয়াজও ছিল না। ব্যতিক্রম মাত্র একটি। বিজয় কুড়ির পরোটার

দোকান। প্রধানতঃ কলেজ হোস্টেলের ছাত্রদের পৃষ্ঠপোষকতাতেই এটি চলত। চায়ের দোকান ছিল না। ১৯৩৩ সনে আমাদেরই এক সহপাঠী ভূপতি ভৌমিক একটি রেস্তোঁরার পত্তন করেছিলেন, কিন্তু নানা কারণেই সেটি বন্ধ হয়ে যায়।

১৯৩১ ইংরেজী সন কলেজের পক্ষে একটি স্মরণীয় বৎসর। কারণ ঐ বৎসরেই কলেজে সহশিক্ষা প্রথম আরম্ভ হয়। ঘটনাটার গুরুত্ব বোঝাবার জন্য কোচবিহারের তৎকালীন সামাজিক অবস্থা বলা দরকার। নারীজাগরণের ঢেউ তখনও কোচবিহার শহরে এসে পৌঁছায় নি। মধ্যবিত্ত ঘরেও মেয়েরা দিনের আলোয় বাড়ীর বাইরে বেরোতেন না-ভিন্ন পাড়ায় নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যেতেও ঘোড়ার গাড়ী চড়তেন। মদনমোহন বাড়ীতে রাসযাত্রা উপলক্ষে পুতুল সজ্জা দেখতে আসার জন্যে একটি নির্দ্দিষ্ট দিন থাকত। এই দিনটিকে বলা হত 'সর্ণা'। এই দিন দুপুর থেকে সন্ধ্যে পর্য্যন্ত মদনমোহন বাড়ীতে পুরুষের প্রবেশ ছিল নিষিদ্ধ। এমন কি ১৯২৯/৩০ সন পর্য্যন্ত সে সময়কার কোচবিহার শহরের একমাত্র উচ্চ-বালিকা বিদ্যালয়, সুনীতি একাডেমিতে উচ্চশ্রেণীর ছাত্রীদের বাড়ী থেকে নিয়ে আসা আর বাড়ীতে পৌঁছে দেবার জন্য রাজসরকার থেকে একটি বাসের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। বয়স্কা মেয়েরা দিনের বেলা হেঁটে স্কুলে যাবে, এটা অভিভাবকেরা পছন্দ করতেন না।

এ অবস্থায় মেয়েরা কলেজে যাবে, আর ছেলেদের সাথে একসাথে পড়বে এ নিয়ে শহরে যে কিছু চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়নি এমন নয়। কিন্তু যাঁরা এ বিষয়ে অগ্রণী হলেন এবং যে সব পরিবার থেকে ছাত্রীরা এলেন সে সব পরিবারের কর্তারা শহরের মধ্যে ছিলেন প্রতিষ্ঠাপন্ন এবং সর্বজনশ্রদ্ধেয়। এঁদের মধ্যে ছিলেন ৺অশুমান দাশগুপ্ত (মহারাজার শিক্ষক এবং পরে রাজ্যের একাউন্টেন্ট জেনারেল), ৺বিমলা কান্ত চক্রবর্তী (জেনকিন্স স্কুলের বাংলা শিক্ষক এবং কোচবিহারের প্রথম ঔপন্যাসিক), সুকুমার সেন (কোচবিহার ষ্টেট ব্যাঙ্কের ম্যানেজার)। কোচবিহারে নারীশিক্ষার প্রগতিতে এঁদের দান অবিস্মরণীয়। ছেলেমেয়ে একসাথে পড়া নিয়ে তাই রক্ষণপন্থীরা কোনও বিরুদ্ধতা করবার সুযোগ পান নি। তবে এও ঠিক যে সুনীতি একাডেমী থেকে যাঁরা ম্যাট্রিক পাশ করতেন, ১৯৩১ এর অনেকদিন পর পর্য্যন্তও তার একটি নগণ্য সংখ্যাই কলেজে ভর্ত্তি হতেন।

যা হোক, ১৯৩১ সনে ভর্ত্তি হলেন ছয়টি ছাত্রী, চারজন ফার্ষ্ট ইয়ারে এবং দুজন সেকেণ্ড ইয়ারে। এঁদের উপস্থিতিতে ছাত্রদের মধ্যে যে কিছুমাত্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়নি এমন কথা বললে সত্যের অপলাপ হবে। মেয়েরা ছেলেদের থেকে সর্বদাই একটা দূরত্ব বজায় রেখে চলতেন। কলেজে কোনও ছাত্রের সাথে তাদের সামান্যতম মৌখিক বাক্যালাপও ছিল না। তাদের কমনরুম ছিল আলাদা, তাঁরা ক্লাসে ঢুকতেন

অধ্যাপকের সাথে, আর পিরিয়ডের শেষে বেরিয়ে যেতেনও তাঁরই সাথে। ছাত্রদের সাথে কলেজের সংস্কৃতি-মূলক অনুষ্ঠানেও তাঁরা সক্রিয় ভাবে যোগ দিতেন না, কলেজের অভিনয়ে অংশ নিতেন না। এমন কি, ১৯৩৩ সনে প্রথম যখন নির্বাচনের মধ্য দিয়ে কলেজ ইউনিয়ন গঠিত হ'ল, এ'রা না নিলেন নির্বাচনে কোনও অংশ না যোগ দিলেন ইউনিয়ন আয়োজিত কোনও সাংস্কৃতিক উৎসবে। যদিও এটা খুবই সত্যি যে তৎকালীন সামাজিক পরিবেশে এসব ব্যাপারে যোগ দেওয়া তাঁদের পক্ষে সম্ভব ছিল না—ছাত্রদের কাছ থেকে দূরত্ব রক্ষা করে চলাটা ছিল তাঁদের ওপর আরোপিত গণ্ডী, ছাত্রদের কিন্তু এতটা তলিয়ে দেখার মানসিকতা ছিল না। সুতরাং তাঁদের এই দূরে দূরে থাকার অনিবার্য ফলশ্রুতি ছিল, ছাত্ররা নিজেদের গা বাঁচিয়ে এ'দের বিব্রত করার চেষ্টার কোন ত্রুটি করত না। এ'দের নির্দ্দিষ্ট বেঞ্চে কালি পড়ে থাকত, এ'দের ডেস্কের দোয়াত থেকে সালফিউরেটেড্ হাইড্রোজেনের দুর্গন্ধ বেরোত, বর্ষার মধ্যে ক্লাশের বাইরে রাখা ছাতা সাময়িক ভাবে উধাও হয়ে যেত। অবশ্য এটা আমি স্বীকার করতে বাধ্য যে এসব নিয়ে আমাদের সহপাঠিনীরা কোন দিন উপর মহলে কোন অনুযোগ করেন নি।

খুব সম্ভব, ১৯৩২ সনে একটি অগ্নিকাণ্ডের ফলে কলেজের পদার্থবিদ্যার পরীক্ষাগারটি সম্পূর্ণ পুড়ে যায়। প্রধানতঃ এই কারণেই ১৯৩৩ সন থেকে কলেজে বি, এস, সি পড়ানো বন্ধ হয়। সুতরাং ১৯৩৩ এ আমরা যখন থার্ড ইয়ারে, তখন ঐ শ্রেণীর ছাত্র সংখ্যা মোট এগারো জন, তার মধ্যে দুজন ছাত্রী। ছাত্র সংখ্যার এ দুর্দশার প্রধান কারণ বি, এস, সি উঠে যাওয়া। তা ছাড়া আরও একটা কারণ ছিল। সেবার আই, এ, পরীক্ষায় ফোর্থ সাবজেক্ট বাদ দিয়ে, ইউনিভার্সিটিতে ফার্ষ্ট হয়েছিল দুজন, দুর্গাকিঙ্কর ভট্টাচার্য (পরবর্ত্তী কালে মালদহ কলেজের অধ্যক্ষ) আর অমিয় চক্রবর্ত্তী (পরবর্ত্তী কালে একসাইজের ডেপুটি কমিশনার)। সপ্তদশ হয়েছিল প্রফুল্ল মিত্র। এরা সবাই বি. এ. পড়তে কলকাতা চ'লে গেল। বাইরের ছাত্রদের একটা বড়ো অংশই এ কলেজে যোগ দিল না। দর্শন আর ইংরাজী ছাড়া অন্য বিষয়ে অনার্স পড়ার সুযোগ না থাকাও সম্ভবতঃ কারণগুলির মধ্যে একটি।

স্কুলে থাকতেই কলেজের প্রবাদপুরুষ অধ্যাপকদের নাম শুনেছি। শুনেছি আচার্য্য ব্রজেন্দ্র নাথ শীলের কথা, অধ্যাপক জয়গোপাল ব্যানার্জির কথা, পণ্ডিত কোকিলেশ্বর শাস্ত্রীর কথা। আচার্য্যদেব 'ত' আমাদের জন্মের আগেই কোচবিহার থেকে চ'লে গিয়েছিলেন—জয়গোপাল ব্যানার্জি বা কোকিলেশ্বর শাস্ত্রীর অধ্যাপনার সুযোগও আমরা নিতে পারিনি। আমাদের কলেজে ঢোকবার বহু বহু পূর্বেই তাঁরা এ কলেজ থেকে চলে গেছেন।

আমাদের সময় প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন মনোরথধন দে। পড়াতেন পদার্থ-বিজ্ঞান। এমন আকর্ষণীয় ছিল

তাঁর অধ্যাপনা যে কলা-বিভাগের বহু ছাত্রই তাঁর অধ্যাপনা শুনতে যেত। রসায়নের অধ্যাপক ছিলেন ফণীভূষণ চট্টোপাধ্যায়। রসায়নকে তিনি এমন সহজ ক'রে দিতেন যে সাধারণ ছাত্রও ষাট্/সত্তর নম্বর পেত। লাডলী মোহন মিত্রের লেখা রসায়নের বই পাঠ্য ছিল কিন্তু ফণীভূষণ বাবুর পড়াবার গুণে, ও বই কাউকে কোনোদিন খুলতে হয় নি।

ইংরাজীর প্রধান অধ্যাপক ছিলেন শরৎ চন্দ্র গুপ্ত। মনোরঞ্জন দে অবসর নেবার পর ১৯৩৩ সনে (১৯৩২?) ইনি প্রিন্সিপ্যাল হন। এঁ'র একটা অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। বই খুলে পাঠ্য অংশ প'ড়ে যেতেন, থামতেন-এবং নিজে থেকেই থামতেন এমন জায়গায় যেটা আমাদের বুঝতে অসুবিধে হ'চ্ছে। কি ক'রে যে বুঝতেন, তা তিনিই জানেন। সেই অংশের ব্যাখ্যা ক'রে আবার অগ্রসর হ'তেন। তাঁর পড়াবার গুণে সেক্সপীয়রের নাটকও আমাদের কঠিন মনে হ'ত না।

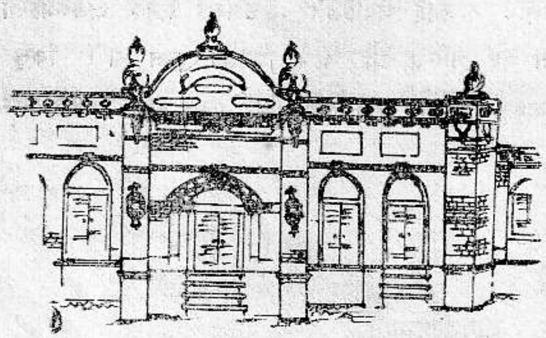
ছিলেন অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী সংস্কৃতের অধ্যাপক পণ্ডিত নিত্যগোপাল বিদ্যাবিনোদ। সংস্কৃত সাহিত্যের রসভাণ্ডারে প্রবেশের চাবিকাঠি তিনিই আমাদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। আমার এখনও সন্দেহ আছে যে তাঁর কবিজনোচিত ব্যাখ্যা ছাড়া 'অভিজ্ঞান শকুন্তলমের' রসগ্রহণ আমাদের সম্ভব হ'ত কিনা। অবশ্য চ'টে গেলে তিনি কলেজের ছাত্রদেরও বকুনী দিতে দ্বিধা করতেন না। এবং এ বকুনী দিতেন ইংরাজীতে। যেমন, 'You moonlike faced boy, sitting in the back bench chattering like monkey, get out from my class'. 'Get out' শব্দদুটো এমন জোর দিয়ে বলতেন যে নির্দিষ্ট ছাত্রটি বিনা বাক্য ব্যয়ে ক্লাশ থেকে বেরিয়ে যেত।

লজিকের এবং দর্শনের অধ্যাপক ছিলেন দুজন। বীরেন্দ্রলাল ভট্টাচার্য্য এবং জিতেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি। বীরেন্দ্রলাল ভট্টাচার্য্য পড়াতেন deductive logic। লজিক এবং দর্শনেরে অন্য অধ্যাপক জিতেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি ছিলেন বরিশালের লোক, অশ্বিনীকুমার দত্তের ছাত্র। বাংলা যখন বলতেন বরিশালের ভাষা ছাড়া বলতেন না। নৈতিক চরিত্রের দৃঢ়তায় আর গভীর দেশপ্রেমে তিনি ছিলেন আদর্শ পুরুষ। ক্রিকেট খেলাটা খুবই অপছন্দ করতেন। একবার ক্রিকেট খেলা দেখার জন্য ছুটি চাইতে ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে বলেছিলেন, তিনখানা কাষ্ঠ আর একটুকরা চামড়া দিয়া দ্যাশ হইতে লক্ষ লক্ষ মুদ্রা লইয়া যায়—তোমাগো একটুও লজ্জা হয় না?' এঁ'রা ছাড়াও ছিলেন ইংরাজীর অধ্যাপক প্রফুল্লরঞ্জন ধর, অধ্যাপক অমূল্যরতন গুপ্ত আর ছিলেন সংস্কৃতের অন্য অধ্যাপক—অধ্যাপক হরিদাস সেন। এরকম চরিত্র জীবনে আর দুটি দেখেছি বলে স্মরণ হয় না। তাঁকে কতভাবেই না আমরা উত্যক্ত করেছি, কিন্তু সে সব তিনি মনে রাখেন নি। এমনই ছিল তাঁর আমাদের প্রতি ভালোবাসা।

অনেক কথাই মনে ভিড় করছে—তার অতি সামান্য অংশই বলতে পারলাম। কিন্তু এর মধ্যেও আর একজনের কথা না বললে এ স্মৃতিচারণা একেবারেই অসম্পূর্ণ থাকবে। তিনি ছিলেন কলেজের করণিক যতীন্দ্রনাথ রায়। অবশ্য ও নামে হয়ত অনেকেই তাঁকে চিনবেন না—যে নামে সবাই চিনবেন সে নামটি হচ্ছে পাগলা বাবু। তিনি ছিলেন ছাত্রদের অকৃত্রিম বন্ধু। যে কোনও ছাত্র যে কোনও রকম বিপদেই পড়ুক না কেন, পাগলাবাবুর সাহায্যের হাত তার জন্য সদাই প্রসারিত। সদা হাস্যময়, চিরকুমার পাগলাবাবু কোচবিহার রাজপরিবার থেকে প্রায় সব বিশিষ্ট ব্যক্তিরই পরিচিত। উচ্চপদস্থ অনেক রাজকর্মচারী তাঁর বন্ধু ছিলেন। তিনি চাইলে রাজসরকারে একটা ভাল পদ পাওয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল না। কিন্তু সারাজীবন তিনি অন্যের প্রয়োজনেই পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন, নিজের জন্য কিছু চাইতে কেউ কখনো তাকে দেখেনি।

"মাতৃ ভাষায় সম্পূর্ণ দখল প্রয়োজনীয়। বহুবিধ তথ্যে যথেষ্ট জ্ঞান, দেশের কুসংস্কার থেকে মুক্তি, শিক্ষকদিগের এই গুণগুলি থাকা চাই।"

বিদ্যাসাগর



"ছোট প্রাণ ছোট ব্যথা
ছোট ছোট দুঃখ কথা
নিতান্তই সহজ সরল.........
নাহি বর্ণনারচ্ছটা, ঘটনার ঘনঘটা
নাহি তত্ত্ব নাহি উপদেশ—
অন্তরে অতৃপ্তি রবে, সাঙ্গ করি মনে হবে,
শেষ হ'য়ে হইল না শেষ।"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্মৃতিকথা

অধ্যাপক ক্ষুদিরাম দাস

১৯৫৪ সালের ডিসেম্বর—শেষ। প্রেসিডেন্সিতে নির্বিবাদে কাটাচ্ছি। সহসা কর্তৃপক্ষের হুকুম এল এখখুনি ভিক্টোরিয়া কলেজে যোগ দাও। ব্যাপার কী? ওখানে ছ-সাত মাস বাঙলার অধ্যাপক নেই। শেষ পর্যন্ত ছাত্রেরা ফোন ধ'রে ডি-পি-আইকে কড়া কথা শুনিয়েছে। পরের দিনই প্লেন ধরলাম। আর কলেজে পা দিয়েই গেলাম ক্লাসে। তখনও কানে শোনার অস্পষ্টতা কাটে নি। অনার্সে পনেরো ষোলটি ছেলেমেয়ে। তাদের বেশ ভালোই লাগল। তবে আমার কোচবিহার—সম্পর্ক স্থায়ী হ'ল মাত্র একমাস এগারো দিন। অনেকের মতে এরকম সৌভাগ্য ক'লকাতা-কেন্দ্রিক অধ্যাপকদের কারো ভাগ্যেই ঘটেনি। আমার কিন্তু মনে হয়েছিল, নাঃ, এলাম যখন, মাস ছয়েক থাকতে পারলেই ভালো হ'ত। কারণ, মনোজ্ঞ পরিবেশ, বশংবদ অমায়িক ছাত্রছাত্রী, উদার বন্ধুভাগ্য, সুপরিচ্ছন্ন শহর ও শহরের মানুষ। ভালো সাধারণ গ্রন্থাগারও একটা আছে, বাইরে সভা-সমিতিও মাঝে মাঝে হয়। ক'লকাতা-হুগলী থেকে এসেছেন? বাসা করেননি, ছেলেদের হস্টেলে আছেন? দুপুরে পড়ানোর ফাঁকে যদি মনটা উদাসীন হয়ে যায়, বড় বেশী করে মনে পড়তে থাকে বাড়ীর কথা, বিকেলে ছুটে যান তোড়সা নদীর ধারে, অথবা সকালে তুফানগঞ্জের উদার সড়ক ধরে অন্তত দু'মাইল হেঁটে যান। মন অন্যরকম হয়ে যাবে। আর শীঘ্রমধ্যে যদি স্বগৃহে ফিরে আসেন, আমি নিশ্চিত বলতে পারি, প্রিয়কন্ঠের কথা শুনবেন, কোচবিহারে থেকে এই কটা দিনের মধ্যেই তোমার স্বাস্থ্য কিন্তু বেশ উজ্জ্বল হয়েছে। বন্ধুদের বলি, সরকারি কাজে বদলি অনিবার্য, কিন্তু তাই নিয়ে সব সময় ক্ষুব্ধ থেকে দেশ এবং মানুষের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগটা হারাব কেন? আমি যখন প্রথম গিয়েছিলাম, তখন অবশ্য শহর শরণার্থীতে পূর্ণ। আর সরকারি আবাসনও তৈরি হয়নি।

ক্রিসমাসে কলকাতা ফিরে দ্বিতীয়বার যখন গেলাম, তখন ট্রেন ও বাস ধ'রে শিলিগুড়ি হয়ে। পাহাড়ের উপর দিয়ে সেই অপূর্ব পথটি, আর মাঝখানে তিস্তা। আর জলপাইগুড়ি অঞ্চলের গ্রাম-শহর। সুপারির বেড়া দিয়ে ঘেরা দরমার পাচিল আর টিনের চালা, বাজার-গঞ্জে ভোগ্যে পণ্যের সমাবেশ, পথের দু'পাশ বেগুন, মুলো, বাঁধাকপিতে ঠাসা। আর বর্ষা শেষ থেকে শীত পর্যন্ত তখন মাছ মোটামুটি প্রচুরই বলা যায়। এক একটা আড় মাছ কী বড় হ'ত! আমি তো একদিন দু'জন লোককে বাঁশে ঝুলিয়ে একটা আড় মাছের মাথা নিয়ে যেতে দেখেছিলাম। কলেজ-হস্টেলের ছাদ থেকে কাঞ্চন জঙ্ঘার মাথাটা দেখা যায়। আমি দু'দিন দেখেছিলাম। দার্জিলিঙ্ থেকে যেমন শৃঙ্গযুক্ত দেখা যায়, তেমন নয়, মাথা-কাটা ঠিক জঙ্ঘার মতই দেখতে। আর সেই সঙ্গে প্রভাত রৌদ্রপাতে কাঞ্চনবর্ণও। ঐ সময় আমারই মত ছাত্রদের হস্টেলে থাকতেন ইতিহাসের অধ্যাপক দিলীপ বিশ্বাস, অর্থনীতির কমলাক্ষ ভট্টাচার্য,

বায়োলোজির ক্ষৌণীশ বিশ্বাস। তখন কলেজের উত্তরদিকের লম্বা বারান্দা-দেওয়া ঘরগুলো ছিল আর্টস্ পড়ানোর, পূব দিকের দু'তিনখানা ঘরও তাই। অথবা, কমনরুম ও লাইব্রেরি ছিল হয়ত বা, ভুলে গেছি। পরীক্ষার সময় উত্তর দিকের ঘরগুলোর পার্টিশান সরিয়ে লম্বা হল ঘর বানানো হ'ত। মনে পড়ছে ঐ হলঘরে পরীক্ষার প্রথম দিন গার্ড দিতে গেছি। হল ভর্ত্তি ছাত্র-ছাত্রী। অধ্যক্ষ সুকুমার গাঙ্গুলি মশায় দাঁড়িয়ে আছেন। খাতা দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু তখনও আর কোনো অধ্যাপকই আসেন নি। খানিক পরে আমি অধ্যক্ষকে বললাম, যান, আপনি নিজের ঘরে চলে যান, আমি একাই সব পারব, 'একা রামে রক্ষা নাই'। শুনেই বললেন, তাই যদি হয়, তাহলে সুগ্রীবের দোসর থাকতেই বা আপত্তি কোথায়? নিশ্চয়ই কলেজের এখন সম্প্রসারণ হয়েছে, আর, আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথের নাম সংলগ্ন হওয়ায় কলেজটি গৌরবযুক্ত হয়েছে। এইসঙ্গে আমি কল্পনাও করছি যে ইউনিয়ন নিয়ে ছাত্রছাত্রীরা সাময়িকভাবে যতই মতামতের কোলাহল তুলুক না কেন, অন্তঃকরণে তারা আজও তেমনই আছে—তেমনই সরল, তেমনই প্রাণবন্ত।

আমার কোচবিহার থাকার স্বল্প সময়ের মধ্যে লেখালেখির কাজ কিছুই হয়নি, বন্ধু সাহচর্যে, ছাত্র-সাহচর্যে এবং ঘুরে বেড়ানোতেই কেটেছে। তবে সাধারণ গ্রন্থাগারটিতে মাঝে মধ্যে দিয়ে ওখানকার পুরানো পুঁথির তালিকা দেখতে পেরেছি, আর একটি স্মৃতি আমার মনে আজও রয়ে গেছে, তা হ'ল আমার ছাত্রজীবনের কবিতা-লেখার একটা দিনের মত পুনরাবির্ভাব। একটা কবিতা তিস্তাকে ঘিরে, আর একটা "ব্যাণ্ডেল ইস্টিশানে চাঁদ"। ঐ দুটো কবিতা পরে "শনিবারের চিঠি" পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। কেবল 'তিস্তা' কবিতার শেষের দিকের দু'তিনটা লাইন এখন মনে আসছে—

... ...
নেবুর কুঞ্জে মৌমাছি গেল ফিরে।
সত্যি, তিস্তা, বিশ্বাস করো তুমি—
তোমাকে দেখেছি হারানো-স্বপন-ছবি!

শতবর্ষে ভিক্টোরিয়া কলেজ : স্মৃতি ও প্রণতি

ডক্টর সুধীন্দ্র দেবনাথ
সহকারী অধ্যাপক, বাঙলা, বিধাননগর সরকারী কলেজ
[প্রাক্তন ছাত্র, আই. এস্-সি. : ১৯৫৩-৫৫]

রূপকথায় শোনা ছিলো রাজার কথা রাজ্যের কথা, ভূগোলে পড়া ছিলো বৃটিশ ভারতের দুটো-চারটে করদ ও মিত্র-রাজ্যের কথা। মনে-আঁকা মানচিত্রের সেই রাজ্য চোখে-দেখা মাটি-মানুষের রাজ্য হয়ে উঠলো ১৯৫১ সালের জানুয়ারীতে, কুচবিহারের মাটিতে পা ফেলে। পরিচ্ছন্ন প্রশস্ত দীর্ঘ সমান্তরাল রাজপথে তৈরী কিছু আয়তক্ষেত্র-বর্গক্ষেত্রের বিশুদ্ধ বিন্যাসের নাম কুচবিহার শহর। এ যেন এক শিল্পী-স্থপতির হাতে-গড়া মডেল—মাঝে মাঝে রয়েছে পুলিশ লাইন-রাসমেলার মাঠ, রাজবাড়ি-মদনমোহন ঠাকুরবাড়ি, বৈরাগী দীঘি-সাগর দীঘি আর সবুজ গালিচা-বিছানো বিশাল পার্কের সৌন্দর্য-সজ্জা।

১৯৫৩ সালের জুলাই মাসে প্রবেশিকায় সদ্য উত্তীর্ণ একটি কিশোরের মনে একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন এঁকে দিলো যে লাল ইঁটে গড়া বাড়িটি, তার নাম ভিক্টোরিয়া কলেজ। ৫৩-র জুলাই থেকে ৫৫-র ফেব্রুয়ারী—দেড়টি বছর কালদৈর্ঘ্যে একটি জীবনের পক্ষে তুচ্ছ হলেও সেই কিশোরের গোটা জীবনের বৃত্তটি আঁকা হয়ে গেলো ঐটুকু সময়ের মধ্যেই, যার কেন্দ্রে আছে লাল-রঙা ঐ বাড়িটা, আর তার সংলগ্ন টিনের ছাদে-ঢাকা সাদারঙের ক্লাস-ঘরগুলো। ৫৩-৫৫র সেই কিশোরটিই আপাতত এই স্মৃতিচর্চার প্রৌঢ় উচ্চারক। লালবাড়ির বাঁদিকে রসায়ন, ডানদিকে পদার্থ আর মাঝখানে বিস্তীর্ণ গ্রন্থাগার ; সাদাবাড়িতে সাহিত্য ; আর, গণিতের আনাগোনা ছিল লাল থেকে সাদায়।

১৬-১৮ বছর বয়সের কৈশোর যে কোনো জীবনের একটি সংকীর্ণ সন্ধিপর্ব—শৈশব থেকে যৌবনে উত্তরণের মধ্যবর্তী ছোট্ট একটি হাইফেন। ছোট্ট হলেও তুচ্ছ যে নয়, তার প্রমাণ এই লেখক। লালবাড়ির রসায়ন-কক্ষে ডক্টর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের তীর্যক আপ্তবাক্য 'Chemistry means রসায়ন, but it contains no রস at all'—একে নস্যাৎ করে রসের বন্যা বইয়ে দিলেন তরুণ অধ্যাপক ব্রজেশ সেন। অন্ধকার পদার্থ-কক্ষের জ্যোতির্ময় পুরুষ অধ্যাপক জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য পঞ্চাশের দশকের গোড়াতেই মাতৃভাষার বৈদ্যুতিক আলোয় উজ্জ্বল করে তুলে ধরলেন বিদ্যুৎ আর আলোর অধ্যায়। সন্ত্রস্ত নৈঃশব্দকে চূর্ণ করে ধ্বনিত হলো অধ্যাপক তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের (TPC) সাধারণ পদার্থতত্ত্ব আর 'অ-সাধারণ' চুম্বক-তত্ত্ব—সে-কন্ঠের আকর্ষণ চুম্বকের চেয়ে কম নয়। অন্যদিকে সাদাবাড়ি—কবি-অধ্যাপক হরপ্রসাদ মিত্রের কন্ঠ-মাধুর্য আর বাচনভঙ্গি কী এক জাদুতে. সাদা দেয়ালে ঘেরা এক-ঘর কিশোর-কিশোরীকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখে ৪৫ মিনিটের প্রতিটি মুহূর্ত, যার টানে হিন্দীপাঠী সিতাংশু চক্রবর্তীকেও ছুটে আসতে হয় বাঙলার কক্ষে। সেইসঙ্গে

ডক্টর শৈলেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর অক্সফোর্ডীয় উচ্চারণে Method of Science-এর সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ এবং কক্ষের বাইরে বেরিয়ে-আসা সেই বুট-কোট-পরা প্রায় বিজাতীয় অধ্যাপকের নেক্‌টাই-বাঁধা কন্ঠে সস্নেহ স্বজাতীয় প্রশ্ন—'আশ্রমে আইজ্‌ কী দিয়া খাইছ ?'—এসব অভিজ্ঞতা ঐ সাদাবাড়িটাকে মমত্বে মহিমায় চিরকালের জন্যে হৃদয়ের সঙ্গে যুক্ত করে রাখে। লালবাড়ি-সাদাবাড়ির গাণিতিক সেতুবন্ধনে ছিলো অধ্যাপক রমেশ চন্দ্রঘোষ— মধুসূদন প্রামাণিক—কনকেন্দ্র চক্রবর্তীর ত্রৈকোণিক ভূমিকা—রসায়ন-কক্ষে রমেশবাবু, পদার্থ-কক্ষে মধুবাবু আর কলাকক্ষে কনকেন্দ্রবাবুর সরব স্বচ্ছন্দ বিচরণ। 'সাইন্‌ স্কোয়ার থিটা প্লাস কস্‌ স্কোয়ার থিটা ইজিকুয়াল্‌টু হইলো গিয়া ওয়ান্‌'—স্বর্গত অধ্যাপক ঘোষের এই সহাস্য উচ্চারণ ত্রিকোণমিতির মধুর স্বর্গলোকে পৌঁছানোর পথে প্রথম স্বর্গীয় বাণীর মতো প্রতিধ্বনিত হয়ে চলেছে। ঘনবস্তুর ত্রৈমাত্রিক তত্ত্বলোকে পৌঁছে দেবার সহজ পথের সন্ধান দিতে গিয়ে কনকেন্দ্রবাবুর কাগজে তৈরী শংকু চোঙল-উপবৃত্ত-অধিবৃত্ত-পরাবৃত্ত সেদিনের বিস্ময় ভরা দর্শকের মনে এখনো অম্লান অক্ষর। ছোটমাপের শরীরটাকে যথসম্ভব উঁচু করে এবং ছোট্ট ডান হাতটিকে যথাসাধ্য প্রসারিত করে উচ্চতর ব্ল্যাকবোর্ডে বাইনোমিয়াল তত্ত্ব বা স্থিতিতত্ত্বের অংকপাত করতে করতে এক-একটি কবিতার স্তবকের মতো গণিত-স্তবক সাজিয়ে দিতেন অধ্যাপক মধুসূদন প্রামাণিক। স্বভাবসিদ্ধ মধুময় কন্ঠের সহযোগে উচ্চারিত হতো স্তবকে স্তবকে ব্যাখ্যা। ঐ সাদাবাড়ির সঙ্গে সমকোণে লম্বিত জৈব গবেষণাগারের টেবিলে টেবিলে সশস্ত্র খুনী কিশোরদের হাতে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করতো অসহায় অবচেতন দাদুরী-কুল, অণুবীক্ষণের কাচের ওপর সাজানো থাকতো পেঁয়াজ-পাপড়ির পাতলা এক-একটি পর্দা। অধ্যাপক বিমল চট্টোপাধ্যায় আর অধ্যাপক ক্ষৌনীশ বিশ্বাসের এই রহস্যময় জগৎ প্রসারিত ছিলো মধ্যবর্তী মাঠের ওপারে রসায়ন-কক্ষ পর্যন্ত। সে-কক্ষ মুখরিত হতো 'Protoplasm is a jelly-like substance'—বিমলবাবুর মৃদু কন্ঠের এই ধ্রুবপদে, ব্ল্যাকবোর্ড হয়ে উঠতো উদ্ভিদের অদৃশ্য অভ্যন্তরীণ রূপের সহজ চিত্রশালা—ক্ষৌনীশবাবুর অনায়াস চকের স্পন্দনে।

সংগত কারণেই লালবাড়ি-সাদাবাড়ির বিপরীত অথচ সমতুল আকর্ষণের টানাপোড়েনে বিপর্যস্ত হলো বর্তমান লেখকের কৈশোর-স্বপ্ন। দ্বিধার সংকটে সিদ্ধান্ত হলো অনিশ্চিত জটিলঃ শ্যাম রাখি না কুল রাখি—লাল রাখি না সাদা—বিজ্ঞান না সাহিত্য, ব্রজেশবাবুর রসায়ন না হরপ্রসাদবাবুর বাঙলা, অথবা মধুবাবুর গণিত না শৈলেনবাবুর ইংরাজী !

ভিক্টোরিয়া কলেজের প্রথম পর্বে আইনস্টাইন-নিউটন-বয়েল-চার্লস্‌-ডাল্‌টনের তত্ত্ব-ব্যাখ্যাতা হবার যে স্বপ্ন লালবাড়ির অদৃশ্য রেখায় আঁকা ছিলো, দেড় বছরের ব্যবধানে তা ঢাকা পড়লো একটি কঠিন সিদ্ধান্তের সাদা প্রলেপে। বাহ্যত সাদাবাড়ির জয় হলেও লাল রঙটি মিশে রইলো সাদার সঙ্গে চিরকালের জন্য। সেই কারণে, অধ্যাপনার নানা পর্বে রবীন্দ্র-চর্চা অথবা বৈষ্ণব-সাহিত্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে সীমা-অসীম তত্ত্বে স্মরণ করেছি রমেশবাবু-মধুবাবু-কনকেন্দ্রবাবুর গণিত-মন্ত্র, ভাষাতত্ত্ব-ধ্বনিতত্ত্বের ব্যাখ্যায় স্মরণ নিয়েছি ব্রজেশবাবু-আশুবাবুর রসায়ন-তত্ত্বের। এমন কি, মেঘনাদকাব্যের মধ্য দিয়ে কবি মধুসূদনকে বোঝার চেষ্টায় যে-পথটি নির্বাচন করতে হলো ('মেঘনাদবধ কাব্য ঃ

কাব্যকায়া ও কবিকর্ম" গ্রন্থে), সে-পথ মূলত মধুবাবু-কনকেন্দ্রবাবু-টিটিপাসির দেখানো পথ। আর, সে-পথ দেখার প্রথম আলোক-রশ্মিটি এসেছিলো অধ্যাপক দেবেন্দ্র কুমার ঘোষের কন্ঠে শোনা 'বীরবাহুর পতনে'-র উদাত্ত উচ্চারণ থেকে।

জীবনে চলার যে-পথটি খুঁজে নিয়েছি, তার প্রথম প্রান্তবিন্দুর নাম ভিক্টোরিয়া কলেজ। ভিক্টোরিয়া কলেজ-পর্ব আমার জীবনে স্বপ্নের দ্বন্দ্বের দ্বিধার এবং সিদ্ধান্তের পর্ব। লালবাড়ি-সাদাবাড়ি সেখানে মিলে-মিশে এক। ৬৫-বছরের পুরনো ভিক্টোরিয়া কলেজের প্রথম স্পর্শ একটি কিশোরকে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থার যে আশ্বাস দিয়েছিলো, শতবর্ষপূর্তি-লগ্নে তার আহ্বান সেই কিশোরকে একটি পরিতৃপ্ত পরিণত প্রৌঢ় জীবনের সংলগ্ন করলো। অতএব, কৃতজ্ঞ প্রাণের বিনত প্রণাম, বিগত শতাব্দীর শতবর্ষ-উত্তীর্ণ ভিক্টোরিয়া কলেজ!

—০—

ইতিহাসের দর্পনে

জীবন কুমার মুখোপাধ্যায়

এক এক সময় নিজের ছবি নিজের চোখে দেখার ইচ্ছে হয়। কিন্তু যে ছবি কেউ এঁকে দেয় না, আলোকচিত্রও তুলে দেয় না কেউ। এইভাবেই দিন যায়, মাস যায়, পেরিয়ে যায় বছরের পর বছর। সময়ের সেই তীব্র গতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অনবরত ছুটতে ছুটতে নিজের যে পরিবর্তন অনিবার্যভাবে সাধিত হয়ে যাচ্ছে। তত্ত্বগতভাবে তা উপলব্ধি করলেও তথ্যগত ভাবে তাকে জানবার অবকাশ দেয় না সময়। কিন্তু সেই জন্যই যে পরিবর্তনকে পর্যবেক্ষণ করা, তাকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা আমাদের কর্তব্য-কর্মের বাইরে থেকে যাবে, তা হতে পারে না। তাই প্রত্যহ না হোক, অনেকদিন পরে অন্ততঃ একবার সেই কর্তব্যকর্ম করার সুযোগ নিজেদেরই সৃষ্টি করে নিতে হয়। আমরা আহ্লাদ করে সেই সুযোগগুলোর নাম দেই 'জয়ন্তী' অনুষ্ঠান, কিন্তু আসলে তা ইতিহাসের মুখোমুখি হওয়া। বিগত বছরগুলিতে এই কর্মের জগতে আমরা কী কী স্বাক্ষর রেখে এসেছি, এর মধ্যে কোন্‌গুলি কালের জলে ধুয়ে যাবে, আর কোনগুলিই বা পরবর্তীদের পথ পরিক্রমায় সাহায্য করবে, তার যাচাই করার ঐতিহাসিক দায়িত্ব এই অনুষ্ঠানগুলিতে। এ বড় কঠিন দায়িত্ব। কারণ ইতিহাস বস্তুতঃই কঠিন, উদাসীন, নির্মম। কাজেই নিজের সম্বন্ধে যাবতীয় মোহ বিসর্জন দিয়ে সমিধের মতো নিজেকে সঁপে দিতে হয় ইতিহাসের আলোকশিখায় ইতিহাসের আলোককে অব্যাহত রাখতে। তারপর ইতিহাসের আলোকে নিজের যেটুকু উদ্ভাসিত হবার মতো বলে প্রতিপন্ন হবে, আর যতটুকু অন্ধকারে হারিয়ে যাবে, তাদের সবগুলির কারণ বিশ্লেষণ করে পরবর্ত্তী অন্ত্যর্থক পথপরিক্রমার ছক তৈরী করে নিতে হবে। দশ-পঁচিশ-পঞ্চাশ কিংবা শতবর্ষে এই কঠিন সুন্দর অবকাশেরই আয়োজন আমরা করি ইতিহাসের প্রতি অনুগত থেকে।

আজ একসময়ের ভিক্টোরিয়া বা আজকের ব্রজেন্দ্রনাথশীল মহাবিদ্যালয়ের শতবর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান সেই রকমেরই একটি অনুষ্ঠান, যেখানে আমরা প্রাচীনতার কৌলীন্য জ্ঞাপক নানাবিধ আনন্দানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বারে বারেই কিন্তু ফিরে তাকাব যা কিছু নিয়ে আমরা প্রাচীন, সেই সব উপাদান উপকরণের দিকে এবং যাচাই করে দেখে নেব নিজেদের আত্মিক অবস্থান সঠিক রয়েছে কিনা ; অতীতের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের নেতৃত্বাধীন বর্তমান অন্ত্যর্থক ভবিষ্যৎ গড়ার পক্ষে কতটা যথেষ্ট, কতটাই বা অনুকূল। একশ বছর অতিক্রম করে এসে আজ অন্ততঃ আরো কয়েকটি একশ বছর অতিক্রম করার প্রয়োজন যদি আমরা অনুভব করি তবে এছাড়া আমাদের গতি নেই। একে বাদ দিয়ে একশ বছর, কি হাজার বছর অতিক্রম করার শপথ একটা সার্বিক প্রতারণা এবং সেই সঙ্গে নিজের সৃজনীচৈতন্যের অবমাননা ছাড়া আর কিছুই নয়।

যে সৃজনীচৈতন্য নিয়ে মানুষের বিশেষ পরিচয়, যাকে হাতিয়ার করে জীবজগতে মানুষের আধিপত্য, সেই

শতাব্দী স্মরণী

শতবর্ষ কালের বিচারে নগন্য সময়-ফলক মাত্র। কিন্তু একটি উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে, বিশেষতঃ এই দেশে, এখবরটি গৌরবের ও অহংকার প্রকাশের পক্ষে যথেষ্ট। কত উথান-পতন, আশা-নিরাশার বন্ধুর পথ পরিক্রমা করে একটি প্রতিষ্ঠান শতবর্ষের স্বর্ণালী ফলক স্পর্শ করে। শতবর্ষের প্রদীপ্ত শিখার আলোকে সে ঘোষণা করে—আমি পথভ্রষ্ট হই নি, বাঁধা বিপত্তি আমাকে দমিত করতে পারে নি, অবলুপ্তির অন্ধকার আমাকে গ্রাস করতে পারে নি, শতবর্ষের ফলক স্পর্শ করে আমি এগিয়ে যাব আর এক শতবর্ষের দিকে। আজকের আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল (পূর্বতন ভিক্টোরিয়া কলেজ) মহাবিদ্যালয় এই গর্বের প্রতীক।

ইতিহাস কথা বলে। শতবর্ষ পূর্বের ইতিহাস আজ পাখা মেলতে চায়। আজকের কোচবিহার তখন ইংরেজরাজ-শক্তির করদামিত্র রাজ্য। ১৮৮৮ সাল, ১৫ জুন স্থাপিত হল এই মহাবিদ্যালয়—ভিক্টোরিয়া কলেজ। এর ঠিক একদশক আগে রাজসাহী কলেজ স্থাপিত হয়ে গেছে। সমগ্র আসাম ও বাংলার উত্তরাঞ্চলে রাজশাহী কলেজ ছাড়া ভিক্টোরিয়া কলেজই হচ্ছে প্রথম মহাবিদ্যালয়। লক্ষ্য করবার বিষয় এই সময়টায় বাংলাদেশে রেনেসাঁসের জাগন-মাতন শুরু হয়ে গেছে। সিপাহী বিদ্রোহের প্রভাবে ভেসে যাচ্ছেন তরুন সমাজ। পরাধীনতার জ্বালা ভুলতে শুরু হয়ে গেছে দেশজুড়ে স্বদেশী শিক্ষার প্রচার ও প্রসার। জ্ঞানপিপাসু মানুষ 'বাতিওয়ালা'র ভূমিকা নিয়ে এগিয়ে এসেছেন। আপাতদৃষ্টে মনে হতে পারে এই স্বাদেশীকতার মহাপ্লাবনের পলল-সঞ্চয় এই মহাবিদ্যালয় ভিক্টোরিয়া কলেজ।

শতবর্ষের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে ইতিহাসের এই সত্য আজ স্মরণ করাই শ্রেয় যে এই মহাবিদ্যালয়ের পরিকল্পনা করা হয়েছিল ইংরাজ প্রবর্তিত নয়া ইংরাজী শিক্ষা প্রসারের সূত্র ধরেই। মনে রাখতে হবে, ইংরাজ-করদ-মিত্র রাজ্য কোচবিহারে স্বাধীনতার বিন্দুমাত্র উচ্চারণ দন্ডিত হত কঠিন হস্তে। কোচবিহার রাজ্যে ১৮৫৭ সালের আগে শিক্ষার চিত্রটি স্পষ্ট নয়। মহারাজ নরেন্দ্র নারায়ন রাজপরিবারের সভ্যদের জন্য একটি বাংলা স্কুল স্থাপন করেন ১৮৫৭ সালে। ১৮৬১ সালে তৈরী হয় জেন্কিন্স স্কুল। এখানেও ইংরাজ পুরুষদের উদ্যোগ ছিল। কর্ণেল জেন্কিন্স নাবালক রাজা নরেন্দ্র নারায়নের রাজত্ব রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরই প্রচেষ্টায় রাজা নরেন্দ্র নারায়ণ ইউরোপীয় শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ওঠেন। কর্ণেল জেন্কিন্স রাজদরবার থেকে প্রাপ্ত তাঁর সমুদয় অর্থ দান করেন জেন্কিন্স স্কুলে। ১৮৮৭-৮৮ সালের তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে স্কুলের সংখ্যা সরকারী ও বেসরকারী ৩২৭টি শিক্ষাখাতে ব্যয় মোট ৮১,১৪৪ টাকা।

মহারাজ নৃপেন্দ্র নারায়ন মাত্র দশমাস বয়সে রাজ্যের রাজা হন। নৃপেন্দ্র নারায়নের সাবালকত্ব লাভের পূর্ব পর্যন্ত কার্যতঃ এই রাজ্য পরিচালিত হয় গভর্নর নিযুক্ত কমিশনারগনের দ্বারা। মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ন ইংরাজ তত্ত্বাবধানে ইউরোপীয় ভাবধারায় মূলতঃ ইংল্যান্ডে শিক্ষিত হন। ১৮৮৩ সালে মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ন নিজ হাতে রাজ্যভার

তুলে নেন। আধুনিক কোচবিহারের স্থপতি ইনি। ইংরাজী শিক্ষার সুফল ছাড়াও নৃপেন্দ্রনারায়ণ এদেশের উদার-নৈতিক ভাবধারার সঙ্গে যুক্ত হন ব্রহ্মানন্দ কেশব সেনের কন্যা সুনীতি দেবীর সঙ্গে পরিণয় সূত্রে। ১৮৮৭ সালে State Council-র এক সভায় কোচবিহারে একটি প্রথম শ্রেণীর কলেজ স্থাপনের ব্যাপারটি বিস্তৃত আলোচিত হয়। জেন্কিন্স স্কুলকে ক্রমে উন্নত করে কলেজ তৈরীর প্রস্তাব করা হয়। Mr. Knoller-কে অধ্যক্ষ করবার প্রস্তাবও গৃহীত হয়। কিন্তু তখন সে সব প্রস্তাব বাস্তবায়িত হয় না। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জুবিলী উৎসব উপলক্ষ্যে ১৮৮৮ সালে ১৫ই জুন স্থাপিত হল এই মহাবিদ্যালয়। প্রথম অধ্যক্ষ হন মিঃ গডুলি। এখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রি (এম. এ) ও আইনও পড়ানো হত। সুরু থেকে ১৯০৭ সাল পর্যন্ত এখানে কোন ছাত্রবেতন লাগত না। ফলে বাংলা ও আসামের বিভিন্ন স্থান থেকে এখানে ছাত্ররা আসতেন পড়তে। তাছাড়া বাংলার অন্যান্য অঞ্চল তখন স্বাধীনতার আন্দোলনে আন্দোলিত, অস্থির। কোচবিহারের শান্ত পরিবেশে. পড়াশুনার জন্য অনেকেই আগ্রহী হতেন।

পরপর তিনজন ইংরেজ অধ্যক্ষের পর এই মহাবিদ্যালয়ে আসেন পন্ডিত, দার্শনিক ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহোদয় কলেজের অধ্যক্ষ হয়ে। সুদীর্ঘ ১৬ বছর ধরে তিনি এই কলেজের সেবা করেছেন। মহাবিদ্যালয়ের বর্তমান অট্টালিকার দ্বারোদ্ঘাটন হয় ১৯০৭ সালে। মহারাজ নৃপেন্দ্র নারায়ণ দারোদ্ঘাটন করেন। এই মহাবিদ্যালয়ের গৌরব, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল কোচবিহারে অবস্থানকালেই ১৮৯৯ সালে রোমে এবং ১৯১১ সালে ইংল্যান্ডে যান। তাঁর ভাষন বিশ্বের দরবারে সমাদৃত হয়। বিশ্ব-বরেণ্য এই পন্ডিত কোচবিহার ত্যাগ করেন ১৯১৩ সালে তখন এই কলেজের বয়স পঁচিশ বৎসর।

এই মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষায় ধন্য হয়েছেন কত পন্ডিত, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক ও রাজনীতিজ্ঞ। শৈশবের কত কিশলয় পূর্ণতা লাভ করেছে শ্যামলতায়। এই মহাবিদ্যালয় শুধু ইতিহাসের নীরব সাক্ষী নয়, সে ইতিহাসের রূপকার। মনে আসছে ১৯৪৫ এর কথা। এই মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসের সামনে ঘটে যাওয়া একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে কোচবিহারের সেনাবাহিনী কলেজ ছাত্রাবাসে প্রবেশ করে। নির্বিচারে প্রহার করা হয় ছাত্র-অধ্যাপক সকলকে। এরই প্রতিবাদে সেদিন কোচবিহারের বুকে ঘটে গণজাগরণ। শেষ পর্যন্ত রাজশক্তি, মাথা নোয়ায় জাগ্রত গণশক্তির কাছে।

শতবর্ষের আলোয় দাঁড়িয়ে কার না সাধ হয় এই কথাটি ভাববার—এই মহাবিদ্যালয় সহস্র বৎসর পরমায়ু ভোগ করুক। স্মরণে-মরণে জেগে থাক এই মহতী মহাবিদ্যালয়। ইতিবৃত্তের তো 'ইতি' নেই। জ্ঞাত-অজ্ঞাত কত কর্মী মানুষের প্রাণপাত প্রয়াসের স্মারক এই মহাবিদ্যালয় স্পর্শ করুক অনাগতকালের অসংখ্য শিক্ষার্থী তরুণ গরুড়ের চিন্তা ও চেতনাকে।

সমরেন্দ্র নাথ সাহা।
যুগ্ম আহ্বায়ক, স্মরণিকা উপসমিতি,
আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল (ভিক্টোরিয়া) কলেজ।

কোচবিহার
২৮শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৯

শতবর্ষের ইতিকথা

দীপেন চন্দ

পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যন্ত জেলা যে কোচবিহারে আমরা এখন বাস করি তা একদা স্বাধীন রাজ্য ছিল। সে স্বাধীনতার কাল চারশো বছরের বেশী। ১৫২৩ সালে মহারাজা বিশ্বসিংহ সেই রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ভারতে যখন ইংরেজ শাসনকাল তখন কোচবিহারের সংগে ভুটান রাজের যুদ্ধ আরম্ভ হলে তৎকালীন কোচবিহারের মহারাজা ইংরেজদের সাহায্যের জন্য এক চুক্তির প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন। সেই সূত্রে ইংরেজরা কোচবিহারের প্রতিরক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং সরাসরি না হলেও এই রাজ্যের শাসনকার্যের পরিচালনার ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে।

১৯শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে (১৮৬৩ খ্রীঃ) মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ (বিংশতম মহারাজা) মাত্র দশ মাস বয়সে রাজত্ব লাভ করেন। তখন ইংরেজ কমিশনারের পরামর্শ অনুযায়ী রাজমহিষীরা শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণকে আধুনিক মননশীল রাজা করে গড়ে তুলতে ইংরেজ শাসনকর্তা তাঁকে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য ইংলেন্ডে পাঠান। সেখানে তিনি স্যার বেঞ্জামিন সিম্পসন এবং মিঃ মেলারের অধীনে শিক্ষা লাভ করেন। দেশে ফিরে এসে ১৮৭৯-৮১ সাল পর্যন্ত কোলকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে আইন বিষয়ে অধ্যয়ন করেন। দেশে ও বিদেশে শিক্ষালাভের ফলে মহারাজা পরবর্তীকালে উদার ও প্রগতিশীল মনের পরিচয় দিয়েছেন। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের জ্যোষ্ঠা কন্যা বিদুষী মহিলা সুনীতি দেবীকে ১৮৭৮ সালে বিবাহ করলে কেশবচন্দ্র সেনের সান্নিধ্য পেয়ে মহারাজার চিন্তাজগতে এক বৈপ্লবিক চেতনা গড়ে ওঠে। সেই সঙ্গে ঊনবিংশ শতকের নবজাগরণের ঢেউ কোচবিহারে এসে স্পর্শ করে।

প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর ১৮৮৩ সালে নৃপেন্দ্রনারায়ণ নিজ হস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করলেন। মহারাজাকে রাজ্যভার অর্পণ করে তদানিন্তন লেঃ গভর্ণর প্রকাশ্য দরবারে বলেছিলেন ঃ— "আপনাকে অনেক দিন হতে জানি এবং আমরা উপযুক্ত পাত্রে ক্ষমতা অর্পণ করিতেছি। …সুসভ্যতার প্রারম্ভসূচক সকল কার্য্যই আরম্ভ হইয়াছে। যদিচ এই সকল বিভাগে লাভের সম্ভাবনা নাই অথচ আমি ভরসা করি এসকল বিভাগ আপনি রীতিমত স্থায়ী রাখিবেন। যিনি শিক্ষা ও পূর্ত বিভাগকে উঠাইয়া দিয়া ব্যয় সংক্ষেপ করিতে চেষ্টা করেন তিনি আমার মতে উত্তম শাসনকর্তা নহেন। কারণ, লোকের অজ্ঞানতা বৃদ্ধি এবং স্বাধীনতা ন্যূন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দারিদ্র্যতা ঘটিয়া উঠে। তদ্‌হেতু রাজার আয়েরও অনেক লাঘব হয়। …আপনি অনেকদিন ইংলন্ডে অবস্থান করিয়াছেন। নানা স্থানে বহুবিধ ইংরেজের সঙ্গে আলাপ ব্যবহার করিয়াছেন। আপনি যে কেবল ইংরেজী ভাষাতেই অধিকার লাভ করিয়াছেন এমত নহে। আমাদের রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার, অনেক শিক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু সুখের বিষয় এই যে, আমাদের কোন দোষকর

ব্যবহার অনুকরণ করেন নাই।"

জেনকিন্স স্কুল (১৮৬১) ও সুনীতি একাডেমী (১৮৮১) সালে স্থাপিত হয়েছে। ১৮৮৩ সাল অবধি কোচবিহারে ৩২৪টি বিবিধ স্কুলে দশ হাজার ছাত্র ও ৩০০ ছাত্রী পড়াশোনা করার সুযোগ পায়। এইরূপ পটভূমিকায় ১৮৮৬ সালে কোচবিহারে নববিধান ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্রাহ্মসমাজের প্রভাবের ফলে শিক্ষার প্রভূত অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায়। ১৮৮৬ সালেই কোচবিহার শহরে একটি প্রথম শ্রেণীর কলেজ স্থাপন করা যায় কিনা সে বিষয়ে রাজদরবারে ভাবনা চিন্তা শুরু হয়। ১৮৮৭ সালে ২২শে জানুয়ারি স্টেট কাউন্সিলের সভায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচিত হয়। (১) মহারাজ নিজস্ব অফিস কর্তৃক প্রস্তাবিত প্রথম শ্রেণী কলেজ স্থাপনের রূপরেখা (২) এই প্রস্তাবের উপর দেওয়ান ও সিভিল জজের মন্তব্য (৩) কলেজের অর্থসংস্থান। প্রথম শ্রেণীর কলেজ স্থাপন করা এই মুহূর্তেই সম্ভব নয় বলে সেই সভায় কাউন্সিল অভিমত প্রকাশ করে। বর্তমান জেনকিন্স স্কুলকেই ধীরে ধীরে দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজ হিসেবে উন্নীত করার কথা ভাবা হয়। এবং মিঃ নেলারকে অধ্যক্ষ করার প্রস্তাব বিবেচিত হয়। ২৫শে মার্চের আরেকটি সভায় দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজ স্থাপন না করে ১৮৮৬ সালে মহারাজা যে প্রথম শ্রেণীর কলেজ স্থাপনের পরিকল্পনা করেছিলেন সকল আর্থিক দায়দায়িত্ব সহ তা রূপায়ণের প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১৮৮৮ সালে মহারাণী ভিকটোরিয়ার রাজত্বকালে জুবিলী উৎসবকে স্মরণীয় করে রাখতে মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ ঐ বছরের ১৫ জুন "ভিকটোরিয়া কলেজ" নামে একটি প্রথম শ্রেণীর কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। কলেজ স্হাপনের দিন থেকেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন লাভ করে এম.এ. ল', বি-এ. ও এফ-এ পাঠক্রম চালু হয়। সমগ্র উত্তরবঙ্গ ও আসাম অঞ্চলের সকলের জন্য ১৮৭৮ সালে রাজশাহী কলেজ প্রতিষ্ঠার দশ বৎসর পর ভিকটোরিয়া কলেজ প্রতিষ্ঠা হয়। মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণ শুধুমাত্র কলেজ প্রতিষ্ঠাই করেন নি রাজ্যে মাধ্যমিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য প্রতিটি মহকুমা শহরে উচ্চবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে মহারাজা ও তদীয় বিদুষী পত্নী সুনীতি দেবীর প্রগতিশীল মনের পরিচয় পাওয়া যায়। মহারাজার শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে ১৯১৭ সালে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের উক্তিটি তাদের প্রগতিশীল চিন্তাধারার সঠিক মূল্যায়ন—"স্বর্গত মহারাজের (মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণ) উদ্যোগে ও চেষ্টায় কোচবিহারে যেরূপ শিক্ষা বিস্তার হইয়াছে আমরা বৃটিশ ভারতের অধিবাসী হইয়া দেখিতেছি বৃটিশ ভারতে তেমন হয় নাই।"

কলেজটি প্রথম কোথায় শুরু হয়েছিল তার তথ্য সঠিকভাবে জানা সম্ভব হয়নি। তবে যতদূর জানা যায় রাজবাড়ির পেছন দিকে কলেজ আরম্ভ হয়েছিল। তবে এটা জানা যায় সাগরদিঘীর পশ্চিমপাড়ে কোন "আউট হাইসে" কলেজ ছাত্রাবাস ছিল। এবং তার সন্নিকটে রাজগণ ছাত্রদের জন্য আরেকটি বোর্ডিং ছিল। ১৮৯০ সালে ছাত্রাবাস দুটি পুড়ে যায় তখন শিক্ষাবিভাগের সুপার কালিদাস বাগচি ও সত্যচরণবাবুর বাড়িতে ছাত্রাবাস দুটি স্থানান্তরিত হয়। আরেকটি নথি থেকে জানা যায় "ব্যান্ড মাষ্টার বাংলো" এবং পুরনো পি. ডব্লিউ. ডি অফিস ভবনে কলেজ সাময়িকভাবে চলেছিল। পরবর্তীকালে পুরাতন প্যারেড গ্রাউন্ডের উত্তরভাগে কলেজের নিজস্ব বাড়ি তৈরী হলে ১৯০৭ সালে

স্থায়ীভাবে সেই বাড়িতে কলেজ আরম্ভ হয়। কলেজের লাল বাড়িটি সুন্দর কারুকার্যময় নানা অলংকরণে সজ্জিত। এই বাড়িটি তৈরী করতে সত্তর হাজার টাকা খরচ হয়।

মহারাজা প্রতিষ্ঠিত এই কলেজে অধ্যয়নের জন্য ১৮৮৮-১৯০৭ পর্যন্ত কোনরকম ছাত্রবেতন ছিল না। কলেজের সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহণ করত কোচবিহার রাজসরকার। আইন বিভাগে ১৮৯০ সালে দু'টাকা ছাত্রবেতন ধার্য্য হয়। এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় সুনীতি একাডেমীতে ছাত্রীদের কোন মাসিক বেতন এখন পর্যন্ত নেই। অবশ্য বর্তমানে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার প্রত্যেক স্কুলেই অবৈতনিক শিক্ষা চালু করেছে। বিনা বেতনে কলেজে পড়ার সুযোগ থাকায় পূর্ব বাংলা, উত্তরবাংলা ও আসাম অঞ্চল থেকে বহু ছাত্র পড়তে আসত। তখন প্রতি ছাত্রের গড় খরচ ছিল বার্ষিক ২০৬·০০ টাকা।

কলেজ শুরু হয়েছিল ১৬জন ছাত্র নিয়ে। ১৯৮৯ সালে সকল ক্লাসে ছাত্র সংখ্যা হয় ৬৮ জন। এই কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ পদ অলংকৃত করেন এম. জে. সি. গডলি (M. J. C Godley) তাঁর সময়ে ইংরেজী, গণিত, বিজ্ঞান, দর্শন ও সংস্কৃত বিভাগে অধ্যাপকবৃন্দ হলেন জয়কৃষ্ণ সেন, রাজমোহন সেন, গোবিন্দচন্দ্র দাস, যোগেশচন্দ্র সিংহ রায় ও শরৎচন্দ্র গুপ্ত। একমাত্র ইংরেজী ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে একজন করে অধ্যাপক থাকায় পঠনপাঠনে অসুবিধা দেখা দেয়। অন্যান্য সরকারী কলেজের মত আর একজন করে সহকারী অধ্যাপক নিয়োগের জন্য অধ্যক্ষ স্টেট কাউন্সিলের কাছে আবেদন করেন। পরের বছর (১৮৯০) অধ্যাপক সংখ্যা বাড়েনি তবে কিছু রদবদল হয়েছিল। অধ্যক্ষ গডলির স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন মিঃ ডাব্লিউ. এইচ. উড (W. H. Wood) গণিতের অধ্যাপক রাজমোহন সেনের স্থানে আসেন রঞ্জনপ্রসাদ নিয়োগী এবং অফিসের বড়বাবু গুরুদাস ব্যানার্জী জেনকিন্স স্কুলে বদলী হলে সেই জায়গায় প্রাণগোপাল রায় নিযুক্ত হন। ১৮৯০-৯১ সালে কলেজের স্টাফ প্যাটার্ন ছিল অধ্যক্ষ—১ জন, অধ্যাপক—৬ জন ও অন্যান্য কর্মচারী ৭ জন, মোট ১৪ জন। তাঁদের বেতন ও বেতনক্রম ছিল নিম্নরূপ :

অধ্যক্ষ—ডাব্লিউ, এইচ. উড—৫৫০ টাকা (৫০০-৫০-৭০০)

অধ্যাপকবৃন্দ ইংরেজী—জয়কৃষ্ণ সেন—২০০ টাকা (১৫০-৩০-৩০০)
গণিত—রজনীপ্রসাদ নিয়োগী—১৭০ টাকা (১৫০-২০-২৫০)
বিজ্ঞান—মহিমমোহন রায়—১৫০ টাকা (১৫০-৩০-৩০০)
দর্শন—যোগেশচন্দ্র সিংহরায়—১৪০ টাকা (১০০-২০-২০০)
সংস্কৃত—শরৎচন্দ্র গুপ্ত—১২০ টাকা (১০০-১০-১৫০)
আইন—যদুনাথ ভট্টাচার্য্য—৫০ টাকা (নির্দিষ্ট)

অন্যান্য কর্মচারীবৃন্দ—
বড়বাবু—প্রাণগোপাল রায়—২৫ টাকা (নির্দিষ্ট)
দপ্তরী—কালীনাথ কর—১০ টাকা (নির্দিষ্ট)

ল্যাব পিয়ন—রামলাল ঘোষ—৮ টাকা (নির্দিষ্ট)
চাপরাশী—সদি সিং—৬ টাকা (নির্দিষ্ট)
দারোয়ান—সদাগর কুর্মি—৬ টাকা (নির্দিষ্ট)
মালি—হাবরনি দোসাড়—৬ টাকা (নির্দিষ্ট)
সুইপার—তোফা—৬ টাকা (নির্দিষ্ট)

শরৎ চন্দ্র কবিরাজ বি. এ. মহাশয়কে বোর্ডিং হাউসের সুপার নিযুক্ত করা হয়েছিল। তিনি প্রয়োজনে ইতিহাস ও প্রাথমিক বিজ্ঞানের ক্লাসও নিতেন। সে সময় বি. এ. পরীক্ষার্থীদের কোলকাতা গিয়ে পরীক্ষা দেওয়ার অসুবিধা বিবেচনা করে অধ্যক্ষ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে কোচবিহারে পরীক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করবার জন্য অনুরোধ করেন। সে অনুরোধ রক্ষিত হয়েছিল। ১৮৯০ -৯১ সালে মোট ছাত্র সংখ্যা ছিল ১২৪ জন। (প্রথম বর্ষে ৪৫, দ্বিতীয় বর্ষে ৪৩, তৃতীয় বর্ষে ২৪, চতুর্থ বর্ষে ১৪ এবং পঞ্চম বর্ষে ৮)।

১৮৯২ সালে অধ্যক্ষ উড কোলকাতায় মার্টিনার কলেজে অধ্যক্ষ হয়ে চলে গেলে আরেক জন ইউরোপীয় মিঃ সি. এফ. দ্য লা ফসে্ (C F De La Fosse) অধ্যক্ষ পদে বৃত হন। তাঁর কার্যকাল ছিল ১৮৯৬ সালের প্রথম ভাগ পর্যন্ত। সেই সময় ৬৯৭০·০০ টাকা ব্যয়ে অধ্যক্ষ-এর বাসস্থানের জন্য একটি পাকা বাড়ি তৈরী হয়। মিঃ ফসের কালে দর্শন ও গণিত বিভাগের যোগেন্দ্রপ্রসাদ সিংহ ও রজনী প্রসাদ নিয়োগীর স্থলে জেনকিন্স স্কুল থেকে বীর চন্দ্র সিংহ ও উপেন্দ্র নারায়ণ সিংহ অধ্যাপক পদে যোগ দেন। গোপালকৃষ্ণ সিংহকে অস্থায়ীভাবে দর্শন বিভাগের অধ্যাপক নিযুক্ত করা হয়। ১৮৯৪ সালে গণিতের অধ্যাপক মোহিনীমোহন রায় পদত্যাগ করলে জ্যোতিভূষণ ভদ্র কাজে যোগ দেন। ইংরেজী বিভাগে ললিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্থানে জয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ১৫০-২০০ টাকা বেতনক্রমে অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন।

পরপর তিনজন ইউরোপীয় অধ্যক্ষের পরে প্রথম ভারতীয় অধ্যক্ষ হলেন প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের জ্ঞানভান্ডারের ধারক বাহক পন্ডিতপ্রবর আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল। তিনি সুদীর্ঘ ১৬ বছর অধ্যক্ষ পদ অলংকৃত করে কোচবিহার ভিকটোরিয়া কলেজকে বিশ্বের দরবারে পরিচিত করে দিয়েছেন। এবং অনেক কৃতী ছাত্র তৈরী করে কলেজের নামকে গৌরবোজ্জ্বল করে রেখে গিয়েছেন। বিদ্যোৎসাহী মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য শীলের জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে ৫০০-৭০০ বেতনক্রমে স্টেট কাউন্সিলের পূর্ব অনুমোদন ছাড়াই অধ্যক্ষের নিয়োগপত্র দিয়েছিলেন। ১৮৯৬ সালের ২৫শে মার্চ আচার্য শীলের অধ্যক্ষপদ গ্রহণ আজ ভিকটোরিয়া কলেজের নামের সংগে এক অচ্ছেদ্যতায় জড়িয়ে আছে। ১৬ বছর এই কলেজের এক স্মরণীয় অধ্যায়। এই সময়কালকে কলেজের সুবর্ণযুগ বললেও অত্যুক্তি হয় না। আচার্য্য শীল শুধু কলেজের প্রাণ প্রতিষ্ঠাই করেন নাই তিনি সমগ্র কোচবিহার জেলায় শিক্ষা প্রসারের জন্য সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। জেনকিন্স স্কুলের পরিচালনার ভারও তাঁর উপর ছিল। জয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনারায়ণ সিংহ, শরৎচন্দ্র গুপ্ত, কোকিলেশ্বর শাস্ত্রী, শ্যামাচরণ চক্রবর্তী (পরবর্তীতে জেনকিন্স স্কুলের প্রধান শিক্ষক।), রমনীমোহন গোস্বামী,

পরেশ চন্দ্র সেন, উমাপতি চ্যাটার্জী, বরদাকান্ত চ্যাটার্জী, সুবোধ চন্দ্র মুখার্জী, কালীপদ মিত্র প্রমুখ অধ্যাপকরা তাঁর সাথে কাজ করবার গৌরবে গৌরবান্বিত হতে পেরেছিলেন।

দার্শনিক ও অধ্যক্ষ হেন্টি তাঁর প্রিয় ছাত্র ব্রজেন্দ্রনাথের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পেয়ে একদা বলেছিলেন—"একদিন ব্রজেন্দ্র শীলের পান্ডিত্যের যশে ভারত কেন ইউরোপ পর্যন্ত ভরিয়া যাইবে।" —তাই হয়েছেন। কোচবিহার ভারতের প্রতিভু হয়ে ১৮৯৯ সালে রোমে এবং ১৯১১ সালে ইংলন্ডে ব্রজেন্দ্রনাথ দুটি মহাসম্মলনে বক্তৃতা করে বিদগ্ধজনের শ্রদ্ধা ও পন্ডিতশ্রেষ্ঠ হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন। কলেজে আচার্য্য শীল ইংরেজী ও দর্শন শাস্ত্র পড়াতেন। তাঁর পান্ডিত্যের গুণে ছাত্ররা বিমোহিত হয়ে তাঁর পড়া শুনতেন। তিনি শুধু দার্শনিক ছিলেন না, ছিলেন অফুরন্ত জ্ঞানের ভান্ডার। ছাত্রদের তিনি প্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন কিন্তু তাদের অশোভন আচরণকে কখনো প্রশ্রয় দেননি। একবার কোন এক অধ্যাপকের সংগে ছাত্রদের গন্ডগোল বাঁধলে ছাত্ররা ক্লাস বয়কট করেন। আচার্য্য ছাত্রদের আচরণে আহত হয়ে বলেছিলেন —"অধ্যাপকেরপ্রতি যাদের শ্রদ্ধা নেই, তাদের পাঠগ্রহণ না করাই ভালো।" ছাত্ররা লজ্জিত হয়ে ক্ষমা চেয়েছিল। আর একটি ঘটনা হল, তিনি তার এক প্রিয় ছাত্রকে একটি বই উপহার দেন। তাতে তিনি with regards লিখে দিয়েছিলেন। এতে ছাত্রটি কুন্ঠা বোধ করলে আচার্য্য শীল বলেন "ছাত্র যেমন অধ্যাপককে শ্রদ্ধা দেখাইবে অধ্যাপকও ছাত্রকে অযথা অসম্মান করিবে না।"

কোচবিহারে অধ্যক্ষ থাকাকালীন ১৯০৩ সালে আচার্য্য শীলের New essags in Critism নামে একটি মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রদর্শন ও কাব্যের বিশদ আলোচনা এই গ্রন্থে করা হয়েছে। এই গ্রন্থ পাঠে আচার্য্য শীলের অপরিমেয় বিচারশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক বিনয় সরকার প্রবাসী পত্রিকায় লিখেছিলেন— "গ্রন্থ-নিবন্ধ প্রবন্ধগুলি পাঠ করিলে বর্তমান জগতের চিন্তামন্ডলে ভারতবর্ষের স্থান সহজেই ধরিতে পারা যায়।"

ভিকটোরিয়া কলেজের পরীক্ষার ফলাফলের পরিসংখ্যান থেকে তদানীন্তন কালের পঠনপাঠনের উন্নতির একটি চিত্র পাওয়া যায়। ১৮৮৮-৯৩ সাল পর্যন্ত মোট ছাত্র ছিল ৫০৩জন। এই পাঁচ বছরে এফ. এ. পরীক্ষা দিয়েছিল ১৭৮ জন। পাশ করেছে ৯০ জন। বি. এ. তে ৬৫ জন। পাশ করেছে ২৮ জন। ও ৬ জন অনার্স। এম এ. তে দুজনে পাশ করেছে একজন। ১৮৯৫ সালে এম এ. পরীক্ষায় দুইজন পরীক্ষার্থীর মধ্যে দু'জনেই উত্তীর্ণ হয়। ১৯০০–১৯০১ সালে এফ. এ. পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ে পাশের হার ছিল শতকরা ৩২ ভাগ। প্রেসিডেন্সী কলেজে ৫৯। আর ভিকটোরিয়াতে ৮৪ ০৩ ভাগ। বি. এ. তে তিনজন অনার্সের মধ্যে একজন বিশ্ববিদ্যালয়ে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছিল। ১৯০৯ সালে এফ-এ উঠে গিয়ে আই. এ., আই এস সি কোর্স চালু হয়। ১৯১১-১৩ সালে আই. এ. তে পরীক্ষা দেয় ১২০ জন। পাশ করে ৭৬ জন। আই এস. সি তে ৩২ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে পাশের সংখ্যা ২৫ জন। বি. এ তে ৪৩ জনের মধ্যে পাশ করে ৩২– তন্মধ্যে অনার্স ১০ জন। ১৮৯০ সালে পদ্মনাথ দাস রাজবংশী ছেলেদের মধ্যে প্রথম বি. এ. পাশ করার গৌরব অর্জন করে। ১৮৯২-৯৩ সালে এই কলেজ থেকে সর্বপ্রথম এম. এ. হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছিল সুরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী। সে সময় ছাত্ররা নিয়মিত ক্লাসে উপস্থিত না থাকলে বা

কলেজ পরীক্ষায় না বসলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার নজীরও পাওয়া যায়।

আচার্য্য শীলের সময়ে কলেজের উন্নতি সম্পর্কে রাজদরবারের অভিমত হল—....fullest recognition is due to Babu B. N. Seal. the PrinciPal who has devoted all the time and attention to the wellbeing as success of the College.

আচার্য্য শীল শুধু কলেজ শিক্ষার জন্য নয় মাধ্যমিক ও প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতির দিকেও লক্ষ্য রেখেছেন। শিক্ষাক্ষেত্রে কোচবিহার যে পিছিয়ে ছিল না বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠান এক প্রতিবেদনের অংশবিশেষ উল্লেখ করলেই তা বোঝা যাবে—....the schools are upto-date is methods of teaching and school management and the residntial arrangements are excellent from the sanitary as well as desciplinary point of view.

১৯১৩ সালে আচার্য্য শীল বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রের ডাকে কোচবিহারের বিদগ্ধ সমাজকে মুহ্যমান করে কোলকাতায় চলে যান। তাঁর এই চলে যাওয়ায় কুচবিহারের পক্ষে এক অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছিল।

কলেজের প্রথম ২৫ বছর এক গৌরবময় অধ্যায়। ১৯১৩ সালে আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ ভিকটোরিয়া কলেজে ও কোচবিহারের শিক্ষাজগতে এক ঐতিহ্যময় পরিমন্ডল গড়ে দিয়ে পঞ্চম জর্জ অধ্যাপক পদ অলংকৃত করবার জন্য কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে যান। আচার্য্য শীলের মতো একজন বিদগ্ধ, বিজ্ঞ, জ্ঞানতাপস ও দক্ষ প্রশাসক যখন চলে গেলেন ভিকটোরিয়া কলেজের একটি অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটল এবং কোচবিহারবাসীদের সংগে একজন বিদগ্ধ পন্ডিতের সম্পর্ক ছিন্ন হল। তার সময়ে কলেজের যে সুনাম অর্জিত হয়েছিল তা রক্ষা করবার ভার পড়ল পরবর্তী অধ্যক্ষ জয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর।

এই কলেজে পড়ার জন্য একজন ছাত্রকে মাসে নয় টাকা খরচ করতে হত। তারমধ্যে রাজসরকার বহন করত ছয় টাকা। ছাত্রাবাসে থাকলে খরচ লাগত মাত্র চার টাকা। প্রতিটি ছাত্রের গড় খরচ ছিল বৎসরে ১১১ টাকা। তার মধ্যে স্টেট দিত ৮১ টাকা। এত কম খরচে পাঠের সুবিধা অন্যত্র ছিল না। কলেজে ছাত্রবৃদ্ধি হওয়ার ফলে সে সময় তিনটি ঘরবিশিষ্ট একটি বাড়ি তৈরী করতে হয়। সেই বাড়ি নির্মান ব্যয়ের জন্য কলেজকে ১৩০০ টাকা করে ঋণ পরিশোধ করার জন্য কলেজ কর্তৃপক্ষকে ছাত্রবেতন তিন টাকা থেকে চার টাকা বাড়াতে হয়েছিল।

১৯১১ সালে কলেজ প্রতিষ্ঠাতা আধুনিক কোচবিহারের রূপকার মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলে মহারাজার স্মৃতিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য ১৯১৩ সালে কলেজে মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের একটি প্রতিকৃতি স্থাপন করা হয়। এই প্রতিকৃতিটি উপহার দিয়েছিলেন প্রিন্স ভিক্টর নিত্যেন্দ্রনারায়ণ। একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তদানীন্তন মহারাজা প্রতিকৃতিটি উন্মোচন করেন এবং রাজদরবারে এক আদেশবলে ৬ই মার্চ কলেজের প্রতিষ্ঠাতা দিবস হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। ১৯১৩ সালের ১৮ ডিসেম্বর স্টেট কাউন্সিলের সভায় যে ঘোষণাটি করা হয়েছিল তা হল—

"His highness the Maharaja Bhup Bahadur in council has been pleased to Institute a Founder's day for the Victoria College and to fix the 6th of march every year for it's celebration on which date the Victoria College and all Schools in the state will remain closed in honour of the occasion,

১৯১৪ সাল থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত প্রতি বছর আনন্দ উৎসবের মাধ্যমে দিনটি পালিত হয়েছে। ক্রীড়া অনুষ্ঠান এই উৎসবের একটি বিশেষ অঙ্গ ছিল। কোন কোন বছর মহারাজা এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতেন। খেলাধুলা ও উৎসবের শেষে মিষ্টান্ন ভোজের আয়োজন ছিল খুব লোভনীয়। এখন আর উৎসব হয় না। তবে ৬ই মার্চ কলেজ বন্ধ থাকে। ১৯৫০ এর আগে এই দিনটিতেই একত্রে কলেজ ও জেনকিন্স স্কুলের স্পোর্টস অনুষ্ঠিত হত।

ছাত্রদের থাকার জন্য তখন যেকটি ছাত্রাবাস ছিল তা হল (১) কলেজের হোস্টেল ও রাজগণ বোর্ডিং, (২) শান্তিকুটীর মেস, (৩) ইন্দিরাকুঠি মেস, (৪) ভিকটর লজ, (৫) মুসলিম মেস। ৮৮ জন ছাত্র থাকতে পারে এমন একটি ছাত্রাবাস নির্মাণের পরিকল্পনা সে সময় গৃহীত হয়।

১৯১৫ সালে জয়গোপাল ব্যানার্জী পদত্যাগ করলে অধ্যক্ষ পদ গ্রহণ করেন টি. এল.ভাপওয়ানি (১৯১৫-১৬)। ১৯৩৭ সাল অবধি অধ্যক্ষ পদ অলংকৃত করেছেন উপেন্দ্রনারায়ণ সিংহ (১৯১৬-২৪)। মনোরথধন দে (১৯২৪-৩৫), শরৎচন্দ্র গুপ্ত (১৯৩৫-৪৩)। মনোরথধনের অধ্যক্ষপদের কার্যকাল ১১ বছর। তাঁর সময়কালে অধ্যাপকদের নুতন বেতনক্রম চালু হয়। তখনকার স্টাফ প্যাটার্ন ছিল—অধ্যক্ষ—১, ইংরেজী—৩, দর্শন—২, গণিত—৩, রসায়ন—২, সংস্কৃত—২, ইতিহাস ও অর্থনীতি—১, করণিক—৩, গ্রন্থাগারিক—১, দপ্তরী—২, দারোয়ান—১, ল্যাব পিয়ন—৪, লাইব্রেরী পিয়ন—১, অফিস পিয়ন—২, অধ্যাপকদের বিশ্রামকক্ষ পিয়ন—১, সুইপার—১। মোট ৩০ জন।

১৯১৭-১৮ সালে কলেজে উল্লেখযোগ্য পরীক্ষার ফলাফল দেখা যায়। আই. এ. তে ১০৩ জনের মধ্যে ৬৪ জন। আই. এস. সি-তে ১৭ জনে ১৩, এদের মধ্যে আই. এ. তে বিশ্ববিদ্যালয়ে অষ্টম এবং আই. এস. সি তে নবম স্থান অধিকার করার গৌরব অর্জন করে এই কলেজ। ১৯১৮ সালে ইংরেজী অনার্সে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন অমূল্যরতন গুপ্ত। যিনি পরবর্তীকালে ৩২ বছর এই কলেজে অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত ছিলেন। বিশ-এর দশকে পরীক্ষার ফলের জন্য যাঁরা কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন তাঁরা হলেন যোগেশচন্দ্র সিংহ, হেরম্বচন্দ্র আতথীড়, প্রমোদচন্দ্র ব্যানার্জী, বীরেশ্বর বক্সী, প্রবোধ লাহিড়ি, ভবেন্দ্র চৌধুরী, বসন্ত মুখার্জী, মধুসূদন প্রামাণিক, ধর্মকান্ত বর্মা, জগদীশ চক্রবর্তী, নলিনীকান্ত সরকার, সুধীররঞ্জন সেন মজুমদার, উমাপদ বিশ্বাস, বীরেন্দ্রলাল সরকার প্রমুখ। ১৯১৩ থেকে ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত এই কলেজের ফলাফল দেখলে কলেজের পঠনপাঠনের অবস্থার কথা জানা যায়।

	পরীক্ষার্থী	পাশের সংখ্যা	হার (শতকরা হিসাবে)
আই. এ.	১৫০৭	৯৭৩	৬৩

পরীক্ষার্থী		পাশের সংখ্যা	হার (শতকরা হিসাবে)
আই. এস.-সি.	৮৮৮	৬০০	৬৮
বি. এ.	১০২২	৫৯৫	৫৮
বি. এস. সি,	১৪৯	৭০	৪৭

(১৯২৫-৩৩)

আই. এস. সি পরীক্ষার ফলাফল বরাবরই ভালো ছিল। এবং বেশী সংখ্যক ছাত্র বিজ্ঞান বিভাগে পড়বার আগ্রহ প্রকাশ করলে ডিগ্রী কোর্সে বিজ্ঞান শাখা খোলার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। তারই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯২৩-২৪ সাল থেকে বি. এস সি কোর্স চালু হয়। কিন্তু বিজ্ঞানে এই ডিগ্রী কোর্স বেশীদিন চালু থাকেনি। ১৯৩৩ সালে এক অগ্নিকান্ডের ফলে ল্যাবরেটরী নষ্ট হয়ে গেলে বি. এস. সি কোর্সটি উঠে যায়। ১৯২৬ সালে টিনের চাল দেয়া দুটি ঘর তৈরী হলে একটি অধ্যক্ষ ও অপরটি অফিসের জন্য ব্যবহৃত হতে থাকে। তখন মূল ভবনের সেন্ট্রাল হলটি গ্রন্থাগার ও পাঠকক্ষ হিসাবে নির্দিষ্ট হয়। হল সংলগ্ন পশ্চিমদিকের কক্ষে অধ্যাপকদের পাঠের ব্যবস্থা ছিল। ১৯৭৩ সালে পর্যন্ত গ্রন্থাগারটি ঐ কক্ষেই ছিল।

বিংশশতাব্দীর প্রথম পাদ থেকে ভারতে রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে ওঠে। তার ছোঁয়া কোচবিহারেও এসে লেগেছিল। বহু স্বাধীনতা আন্দোলনের যোদ্ধা ও বিপ্লবী সন্তানের জন্ম দিয়েছিল এই মহাবিদ্যালয়। রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত শ্রীনিকেতনের অন্যতম পরিচালক এবং স্বদেশী আন্দোলনের হোতা কালীমোহন ঘোষ এই কলেজের ছাত্র ছিলেন। এই কলেজে অধ্যয়ন করেছেন এবং তখন থেকেই রাজনৈতিক আন্দোলনে নিজেদের যুক্ত করেছেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন অনুশীলন সমিতির নায়ক পুলিন দাস, বহরমপুর আদর্শ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ও অসহযোগ আন্দোলনের পুরোধা অম্বিকাচরণ রায়, বিপ্লবী ডাক্তার তারকনাথ দাস, অনুশীলন সমিতির সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, তেজপুরের বিপ্লবী নেতা বিষ্ণুপ্রসাদ রাভা, দুর্গাকিংকর ভট্টাচার্য্য, রমেন ভট্টাচার্য্য, সৌরিন ভট্টাচার্য্য, অরুণ মৈত্র, কমলকান্তি গুহ, শিবেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী প্রমুখ।

১৯৩১ সাল কলেজের পক্ষে একটি স্মরণীয় বছর। কারণ সে বছর থেকেই মহিলাদের পড়ার সুযোগ ঘটল এই কলেজে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সহশিক্ষা চালু করলে প্রশাসনিক অসুবিধা দেখা দেবে বিবেচনায় এতদিন কলেজে একই সংগে ছাত্র-ছাত্রীর পড়াশোনার অনুমতি দেয়নি। কিন্তু ছাত্রী সংখ্যার বৃদ্ধির ফলে বিশ্ববিদ্যালয় তার নিয়ম বদলালে মফস্বলের কলেজগুলিতে সহশিক্ষা প্রথা চালু হয়। প্রথম বছর মহিলা ছাত্রীদের মধ্যে ছিলেন ইন্দুলেখা চক্রবর্তী, জ্যোৎস্না সেন, কোহিনুর রায় প্রভৃতি। ১৯৩৬ সালে ২৪০ জন ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে ছাত্রীর সংখ্যা ছিল ৮। বর্তমানে ১৫০০ ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে ছাত্রীদের সংখ্যা প্রায় ৮০০ জন। কলেজে প্রথম মহিলা স্নাতক হওয়ার গৌরব অর্জন করেছিলেন শ্রীমতী পারুলবালা নন্দী। ১৯২৫-২৬ সালে যে সমস্ত অধ্যাপক এই কলেজে এসেছিলেন তাঁরা হলেন বাঁকাবিহারী দে, ধীরাজয় ভট্টাচার্য্য, ধীরেন্দ্রমোহন মুখার্জী, জীতেন্দ্র চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, টিকেন্দ্রজিৎ দত্ত। ১৯৩৫ সালে মার্চ মাসে মনোরথধন দে অবসর গ্রহণ করলে শরৎচন্দ্র গুপ্ত অধ্যক্ষ হন।

১৯৩৩ সালে কলেজে প্রথম ছাত্রসংসদ গঠিত হয়। তারপর থেকে প্রতি বছর নানাবিধ অনুষ্ঠান ও কার্য্যকলাপের মধ্যে ছাত্রসংসদ নিজেদের অস্তিত্বকে সজীব করে তুলেছে। পুরানো কাগজ থেকে জানা যায় প্রতিবছর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বিতর্ক, নাটক ইত্যাদি নানাবিধ সুকোমল বৃত্তির পরিচর্য্যা করবার সুযোগ ছাত্র-সংসদের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীরা পেয়েছিল। ১৯৩৭-৪০ সালের মধ্যে ছাত্ররা মন্ত্রশক্তি, শাজাহান, প্রতাপাদিত্য প্রভৃতি নাটক সাফল্যের সঙ্গে পরিবেশন করে। কলিকাতা থেকে অনেক বিদগ্ধ জনকে আমন্ত্রণ করে আনা হত। সে সময় কালিকানন্দ ব্রহ্মচারী, ইউ এন ব্যানার্জী, রামকৃষ্ণ রাও, পি. সি. ঘোষ, রিপন কলেজের অধ্যক্ষ এস. সি. চৌধুরী, বিনয় সরকার প্রমুখ শিক্ষাবিদরা নানা বিষয়ে বক্তৃতা দিয়েছেন।

তখন অনেক অসমিয়া ছাত্র এই কলেজে পড়তো। তাদের প্রচেষ্টায় অসমীয়া সাহিত্য বাসর ও শংকরদেবের জন্ম-বার্ষিকীও সাড়ম্বরে পালন করা হতো।

এই কলেজের প্রাণপ্রতিষ্ঠাতা বিশ্ববরেণ্য জ্ঞানতাপস আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের মহাপ্রয়ানে ১৯৩৮ সালের ৩রা ডিসেম্বর ভিকটোরিয়া কলেজের ইতিহাসে একটি শোকাবহ দিবস।

১৯৪৩ সালে ইংরাজীর অধ্যাপক প্রফুল্লরঞ্জন ধর অধ্যক্ষ পদে বৃত হন।

১৯৩৬-৪৪ সাল পর্যন্ত ভাল ফল করে যারা কলেজের মানবৃদ্ধি করেছিল তারা হলো ঃ— ভবানীশংকর ভট্টাচার্য্য, বিধুভূষণ সিংহ, ধীরেন্দ্রনাথ সরকার, নেপালচন্দ্র সরকার, মোহম্মদ অনুদাত প্রধান, নির্মলেন্দু রায়, অজিত কুমার ঘোষ, হরগৌরীনারায়ণ গুপ্ত, ভোলানাথ ব্যানার্জী, গুরুপ্রসাদ বসুরায়, সুনীল ভৌমিক, অরুণ দাশগুপ্ত, অরুণ কুমার মুখার্জী, কালিপদ বক্সী, ধ্রুবনারায়ণ ঘোষ প্রমুখ।

১৯৪৫ সালে একটি সামান্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে কোচবিহার মিলিটারী বাহিনীর একদল সেনা সেদিন নিরীহ ছাত্র, অধ্যাপকদের প্রতি যে অমানুষিক ও বর্বরোচিত অত্যাচার চালিয়েছিল তা শুধুমাত্র ছাত্র শিক্ষক সমাজকে ব্যথিত করে তোলেনি সমগ্র কোচবিহারবাসীর সঙ্গে বাংলাদেশের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষও সেদিন এই জঘন্য কাজের বিরুদ্ধে ধিক্কার জানিয়েছিল। এর প্রতিবাদে ছাত্র সমাজের যে গণতান্ত্রিক আন্দোলন সেদিন সংঘটিত হয়েছিল তার নেতৃত্বে ছিলেন অধ্যাপক দুর্গাকিংকর ভট্টাচার্য্য। আন্দোলনের চাপে কর্তৃপক্ষকে সংশ্লিষ্ট অপরাধীর শাস্তির ব্যবস্থা নিতে হয়েছিল। কোচবিহার এই ধরণের ছাত্র আন্দোলন-এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব আজও স্মরণীয়। কিন্তু বহিরাগত ছাত্ররা রাজরোষ থেকে মুক্তি পায়নি। রাজনৈতিক আন্দোলনে যুক্ত থাকতে পারবে না এই মুচলেকায় ছাত্রদের ভর্ত্তি হতে হত।

১৯৫০ সাল ভিকটোরিয়া কলেজের পক্ষে আর একটি স্মরণীয় ঘটনা। স্বাধীনতার পর কোচবিহার – পশ্চিমবঙ্গের একটি জেলা বলে পরিগণিত হলে ভিকটোরিয়া কলেজের পরিচালকদের পরিবর্তন ঘটে। ১লা জানুয়ারী ১৯৫০ সাল থেকে ভিকটোরিয়া কলেজ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি সরকারী কলেজ হিসাবে পরিচিতি লাভ করে। সেই সরকারী পরিচালনাধীনে আজও কলেজ চলছে। সেই সময় অধ্যক্ষ হিসেবে ছিলেন ডঃ সুকুমার গঙ্গোপাধ্যায়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কলেজ হওয়ার পর পরই আই. এস. সি. তে বায়ো-সায়েন্স কোর্স ও বি. এস. সি. কোর্স চালু হয়। বায়ো সায়েন্সের জন্য একটি টিনের বাড়ী পূর্বদিকে তৈরী করা হল।

সমগ্র উত্তরবঙ্গে দুটি সরকারী কলেজ। তার মধ্যে প্রাচীনতম হলো ভিকটোরিয়া কলেজ। ৫০ সালের পর পূর্ববাংলা থেকে বহু সংখ্যক ছিন্নমূল লোক কোচবিহারে এসে বসবাস শুরু করলে কলেজে ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা প্রতিবছর বাড়তে থাকে। ১৯৫৮ সালে অধ্যাপক ও ছাত্র-ছাত্রীদের বিশ্রামকক্ষের জন্য একটি পাকাবাড়ী নির্মিত হয় সেই সঙ্গে রসায়ন বিভাগের জন্য আরো একটি বাড়ী। সেই বহিরাগত ছাত্রী সংখ্যা এত বেড়ে যায় তাদের বাসস্থানের জন্য ওল্ড প্যারেড গ্রাউন্ডের দক্ষিণ-পূর্ব কোনে ছাত্রীদের জন্য একটি আবাস তৈরী করতে হয়। তাতে ২০ জন ছাত্রী থাকতে পারে। পরবর্তীকালে বাড়িটি দ্বিতল হলে ৪০ জন ছাত্রীর আসন সেখানে নির্দিষ্ট হয়। ১৯৫০ সালে রাজ আমলের স্টাফ প্যাটার্ণ ও বেতনক্রম ছিল নিম্নরূপ ঃ—

অধ্যক্ষ—১	৩৫০-১২০০
সহ-অধ্যক্ষ—১	২৫০-৭৫০
অধ্যাপক—১০	২৫০-৭৫০
(কলা বিভাগ ও বিজ্ঞান বিভাগ)	
লেকচারার—১৩	২০০-৪৫০
জুঃ ডেমনষ্ট্রেটার—৩	১০০-২২৫
শারীর শিক্ষক—১	১০০-২২৫
গ্রন্থাগারিক—১	৯০-১৩০
হেড্ ক্লার্ক কাম একাউন্ট্যান্ট—১	১১০-১৫০
ক্যাশিয়ার—১	৫৫-১৩০
ক্লার্ক—১	৫৫-১৩০
টাইপিস্ট—১	৫৫-১৩০
ল্যাব বিয়ারার—৫	৩০-৪৫
চতুর্থ শ্রেণী—১৫	২০-৪৫

১৯৬২ সাল উত্তরবঙ্গবাসীদের কাছে তাৎপর্যপূর্ণ দুটি বিশেষ কারণে। ঐ সালেই উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় শিলিগুড়িতে স্থাপিত হয় এবং ভিকটোরিয়া কলেজ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সুদীর্ঘ কালের সম্পর্ক ছিন্ন করে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গীভূত হয়। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় হওয়ার ফলে এই কলেজের ছাত্রছাত্রীরা ইংরাজী, অর্থনীতি দর্শন, গণিত ছাড়াও অন্যান্য কলা ও বিজ্ঞান বিষয়ে অনার্স পড়বার সুযোগ লাভ করে। ১৯৬৫ সালের মধ্যেই বাংলা, সংস্কৃত, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইতিহাস, পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন শাস্ত্রে অনার্স কোর্স চালু হয়।

জ্ঞানতাপস আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল দীর্ঘ ষোল বছর (১৮৯৬-১৯১৩) এই কলেজের অধ্যক্ষের পদে বৃত ছিলেন। বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে ১৯৬৪ সালে তার জন্মশতবর্ষ এই কলেজে মহা আড়ম্বরে পালিত হয়। আচার্য্য শীলের শতবর্ষ উপলক্ষ করে তিনদিন ব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানে কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যক্ষ এবং শিক্ষাবিদ্ অমিয় কুমার মজুমদার, উ ব বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য বিনয় দাশগুপ্ত প্রমুখ বিদগ্ধজনের উপস্থিতিতে সে অনুষ্ঠানটি সুন্দর ও মহীয়ান হয়ে উঠে।

তৎকালীন অধ্যক্ষ উমারঞ্জন বর্মন (১৯৬৩-২৭) এর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এবং শতবর্ষ উদ্‌যাপন কমিটির সহায়তায় আচার্য্য শীলের একটি আবক্ষ মর্ম্মর মূর্তি কলেজের সম্মুখভাগে স্থাপিত হয় এবং Homage to Acharja B. N. Seel নামে জন্মশতবর্ষ স্মারক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের স্নেহধন্য প্রত্যক্ষ ছাত্রদের স্মৃতি-চারণায় ঐ পত্রিকাটি একটি মূল্যবান দলিল হয়ে ওঠে। আচার্য্য শীলের নাম এই কলেজে স্মরণীয় করে রাখতে তার জন্মশতবর্ষে একটি ত্রিতল ভবন নির্মান কার্য্য শুরু হয় এবং ১৯৬৯ সালে সেই ভবনটি নির্মিত হলে "আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল সেন্টেনারী ব্লক" এই নামে পরিচিত হয়। নবনির্মিত ভবনে ১৯৭৩ সালে পদার্থবিভাগ, গণিতবিভাগ ও গ্রন্থাগার বিভাগ স্থানান্তরিত হয়।

১৯৬৯ সালে কলেজে ছাত্র-ছাত্রী ভর্ত্তির সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করলে সেই সমস্যার সমাধান করবার জন্য সরকার প্রাতঃকালীন ক্লাস চালু করবার অনুমোদন দেয়। তখন থেকে প্রাতঃকালীন বিভাগ চালু আছে। অধিক ছাত্র-ছাত্রী পড়বার সুযোগ পাচ্ছে কিন্তু প্রাতঃকালীন বিভাগটি দিবা বিভাগের শাখা হয়ে রয়েছে ; যার নিজের অস্তিত্ব রাখতে দিবা বিভাগের দিকে তাকিয়ে থাকতে হয়। কলেজের প্রাণপুরুষ আচার্য্য শীলের নাম অবিস্মরণীয় করে রাখতে ১৯৭০ সালে সরকারের এক বিশেষ আদেশ বলে ভিকটোরিয়া কলেজের নাম পরিবর্তন করে আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল কলেজ রাখা হয়।

ভিকটোরিয়া কলেজের জন্মলগ্ন থেকে এখানে এম এ. ও ল' পড়াবার ব্যবস্থা ছিল। সেই রীতি বর্তমানে চালু হতে পারে। শুধু ছাত্রসমাজ নয় সমগ্র কোচবিহার বাসীর দাবী উত্তরবঙ্গের 'প্রেসিডেন্সী' তে এম. এ. ক্লাশ চালু হোক। যে হারে দিন দিন ছাত্রসংখ্যা কলেজটিতে বাড়ছে এবং পঠন পাঠনের যে সুযোগ আছে তাতে এই কলেজটি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কনস্‌টিটুয়েন্ট কলেজ হওয়ার মতো যোগ্যতা রাখে।

১৯৬২ থেকে ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত কলেজে অধ্যক্ষ পদে বৃত ছিলেন এম. এস. খান (১৯৬২-৬৩), উমারঞ্জন বর্মন (১৯৬৩-৬৭), বিমলকৃষ্ণ ধর (১৯৬৮-৭০), প্রতীপ মুখার্জী (১৯৭০-৭২), নির্মলেন্দু দাশগুপ্ত (১৯৭৩-৭৫), ভাতোষ দত্ত (১ ৭৫-৭৭)। এই সময়কালে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ছিলেন এস. কে দত্ত (১৯৬৭-৬৮), শশীভূষণ দাশ (১৯৭২ ৭৩). ক্ষিতীশ নাথ (১৯৭৩), চিত্তরঞ্জন গুহ (১৯৭৭-৮১), মনোতোষ দাশগুপ্ত (১৯৮১-৮৩) মধুসূদন মৈত্র (১৯৮৩-৮৭), প্রিয়ব্রত মিত্র (১৯৮৭-৮৮)। ১৯৮৮ সালের জানুয়ারি থেকে অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করছেন জীবনকুমার মুখোপাধ্যায়। বর্তমানে বিভিন্ন বিষয়ে ৬২ জন অধ্যাপক ও ৫০ জন অন্যান্য শিক্ষাকর্মী কলেজে কর্মরত।

আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ সহ শত শত বিদগ্ধজনের পাদস্পর্শ লাভ করে আচার্য্য ব্রজেন্দ্র নাথ শীল কলেজে ১৯৮৮ সালে সগৌরবে শতবর্ষ পূর্ণ করে জ্ঞানের দীপশিখা বিকিরণ করে চলেছে।

১৯৮৮ সালে কলেজ শুরু হয়েছিল ১৬ জন ছাত্র নিয়ে। এখন ১৫০০ ছাত্রছাত্রীদের কলকাকলিতে কলেজ প্রাঙ্গন মুখরিত। শতবর্ষের এই কলেজের আনাচে কানাচে কত কথা, কত গুঞ্জন, কত শত শত পদস্পর্শ, তার পূর্ণ বিবরণ দেওয়া সম্ভব হলো না। এবার শুধু এই স্বল্প পরিসরের মধ্যে একটি ছোট্ট রূপরেখা আঁকবার চেষ্টা করেছি পরবর্তীকালে কলেজ-এর একটি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা করবার আশায়।

পরিশিষ্ট-১

New Essays in Criticism : Section III : Neo-romantic movement in Literature – Acharya Brajendranath Seal-এর অংশ-বিশেষের

টীকা-ভাষ্য সহ বঙ্গানুবাদ—অধ্যাপক সরোজনাথ সান্যাল, দর্শন বিভাগ,-এ. বি, এন্, শীল কলেজ, কুচবিহার।

অনুবাদকের বক্তব্য : আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল দর্শনশাস্ত্রের সুবিখ্যাত অধ্যাপক ও বহুধা-বিস্তৃত পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন এ-কথা বিদগ্ধজনমাত্রই জানেন। এখন থেকে একশো বছর আগে (১৮৮৮-১৮৯১) তাঁর মতো অশেষবিৎ জ্ঞানীর সাহিত্য-সমালোচনার ভঙ্গী কেমন ছিল তার সামান্য নমুনা বঙ্গানুবাদে তুলে ধরার প্রয়াস ক'রেছি। আমার মতো স্বল্পজ্ঞ ও অনধিকারীর এমন কাজে স্থূল হস্তাবলেপ প্রাজ্ঞজনের কাছে বিস্বাদ বোধ হবে এটা-ই স্বাভাবিক। কোন-কোন ক্ষেত্রে অনুবাদকের স্বাধীনতা নিয়েছি, পাদটীকায় মন্তব্য-ও ক'রেছি। শব্দ বা শব্দাবলীর চয়নে ও বয়নে অজ্ঞতা স্পষ্টই ধরা প'ড়বে ব'লে কুণ্ঠিত হচ্ছি।

গ্রন্থাকারে ১৯০৩ সালে প্রকাশিত হ'লে-ও প্রবন্ধগুলির রচনা ১৮৮৮ থেকে ১৮৯১-এর মধ্যে। ১৮৯০-৯১ সালে Calcutta Review-এর পাতায় এ-বইটির কতিপয় অধ্যায়ের প্রথম প্রকাশ। Keats-এর উপর লেখা প্রবন্ধটি ১৮৮৮-তে লেখা হ'লে-ও এই গ্রন্থে-ই এটির প্রথম প্রকাশ।

গ্রন্থের আভাষে (Preface) তিনি জানিয়ে দেন যে, দার্শনিক-ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণের প্রেক্ষিত সাহিত্যের প্রয়োগ-গত সমালোচনে বিশেষ ভাবে-ই প্রয়োজনীয়। তুলনামূলক সাহিত্য-বিচার তথা মনোবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে সাহিত্য ও সাহিত্যিককে-ও বুঝে নিতে হবে। লক্ষণীয় যে, লেখক প্রবন্ধগুলির রচনাকালেই (১৮৮৮-৯১) জর্মন দার্শনিক হেগেলের ইতিহাসের একমুখী গতির রেখাঙ্কন এবং Category সমূহের দ্বান্দ্বিক ব্যাখ্যানের বিরোধিতা-ই করেন। জগতের ঘটনাবলীর ইতিহাসের গতি-প্রকৃতির পর্যালোচনা—তা' সে যে-সময় থেকে-ই করা যাক না কেন, এবং নীচুতলার বা উঁচুতলার ঘটনাক্রম অনুসরণ ক'রলে দেখা যাবে যে, ঘটনার উৎসরেখা একটা সম্বন্ধের জালের মধ্যে থেকে-ই ভেঙে ভেঙে যায়। (এবং তাই ইতিহাসের বিকাশের নিয়মটি অসম)। ইতিহাসের ঘটনাবলীর গতিপ্রকৃতির এক নিয়মনিষ্ঠ (ও গতানুগতিক ছকে বাঁধা) ব্যাখ্যা ইতিহাসের দর্শনের প্রেক্ষিতে এবং যথার্থ ইতিহাসের

(বিকাশের নিয়ম-সংক্রান্ত) পদ্ধতি হিসাবে অপ্রচল হ'য়ে প'ড়েছে। এমন-ই হ'য়েছে জীববিজ্ঞানের ক্ষেত্রে **Lamarck**-এর মত (ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝ থেকেই)। এ-কথা-ও অবশ্য-স্মর্তব্য যে, (ঘটনাবলীর) বিভিন্নতা এবং বিবিধ সংস্কৃতির ইতিহাসের স্বতন্ত্র অগ্রগতি অন্তর্নিহিত সামগ্রিক এক বিশ্ব-গতির সঙ্গে এক সূত্রে বাঁধা। সঙ্গে সঙ্গে এ-কথা-ও মনে রাখা প্রয়োজন যে, প্রত্যেকটি সংস্কৃতির নিজস্ব পরিমাপ ও ব্যাপ্তি র'য়েছে। দ্বান্দ্বিকতার কাজ হ'ল বিশ্বগতির রূপরেখাকে খুঁজে বের করা, পরম্পরাগত নিয়ন্ত্রক ধারণাগুলির গ্রন্থন এবং এদের যুক্তিযুক্ত ও সুসমঞ্জস বর্ণন। এ-কাজ ক'রতে গিয়ে সুদূর-প্রসারী কল্পনা বা ইতিহাসের গতি কোন পথে যেতে পারে তার ভান করা কখন-ই উচিত হবে না।

ইতিহাসের গতিপথ বৈজ্ঞানিক আরোহ অনুমানের সাহায্যে অনুমান করা গেলে সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তে আসা যায় না। দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে-ই সুনিশ্চিত গতিপথকে খুঁজে নিতে হবে। **'....pretending to anticipate'....** শব্দগুলি সচকিত করে। অগাধ পাণ্ডিত্য ও মননের সাহায্যে আচার্য শীল হেগেলের দ্বান্দ্বিক ভাববাদী পথ যে অচল তা' বুঝেছিলেন ঊনবিংশ শতাব্দীর আটের দশকেই। ভারতবর্ষের বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে তিনি এ-ধরণের ভাবনার অগ্রপথিক-দের একজন ছিলেন। সুগভীর ও যৌক্তিক পঠন-পাঠন ও মনন যে প্রাগ্রসর চিন্তার কত সহায়ক এ-গ্রন্থে তার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু দুঃখ এই যে, গ্রন্থটি সহজপাঠ্য না হওয়ায় সহজবোধ্য ও সহজপাচ্য নয়। অন্যান্য সাহিত্য ও সাহিত্যিকের তুলনামূলক আলোচনা, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য, সঙ্গীত ও চিত্রানুষঙ্গের অবতারণা আমার মতো সাধারণ পাঠক-কে বিস্মিত করে। অজ্ঞতা-জনিত ত্রুটি বিদগ্ধজনেরা ক্ষমার চোখে দেখবেন, অনুবাদক-টীকা-কারের এটিই-একমাত্র ভরসা।

অনুবাদ : Preface pp i) এবং ii)-এর কিয়দংশ এবং pp 69-76 এর 75 পৃষ্ঠার বাক্যশেষ পর্যন্ত। টীকা ও মন্তব্য অনুবাদকের।

বাংলা সাহিত্যের প্রথম নব্য-রোমান্টিক কবি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এক প্রোজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব। আমরা ইতিপূর্বে আবেগ-বিহ্বল রচনাটিতে[১] যে-গঠন-মূলক সংশ্লেষণের অগ্রগতি দেখেছি তা' একবার মাত্র দেখলেই নিতান্ত-ই আপাত বলে বোধগম্য হয়। রবীন্দ্রনাথে জীবনের নেতিবাচক দিকটি অপ্রধান। কিন্তু 'উদভ্রান্ত প্রেম' নামের রচনাটিতে পৃথিবী যেন মৃত সব মানুষের অস্থি আর কঙ্কালের স্তূপ। স্বর্গ যেন হাজার কাচের ঝাড়বাতির রংবাহার। রচনাটি যেন মানুষকে ডেকে বলে—তোমরা সব্বাই মিথ্যার স্রষ্টা। 'নিজেকে-ও বঞ্চনা কর'—এ-কথাগুলি যেন মানুষের ললাটে অগ্নি-আখরে লিখে-রাখা এক চিরন্তন অভিশাপ। কারণ জীবন এবং প্রকৃতির জ্ঞান—অনন্ত জ্ঞান অতিসূক্ষ্ম পরিব্যাপ্ত এক মোহ-উৎপাদক বিষ তোমার আত্মাতে জন্ম দেয়। সত্যের জ্ঞান ও তার উপলব্ধি যেন জানিয়ে দেয় যে, এটা-ই চরমতম বিষ। নিতান্ত-ই মধুহীন ; গরলমাত্র। কারণ তার হিংস্র খোনা-খোনা ভয়াবহ

হাসি-ই তুমি শুনতে পাও, তার নিষ্প্রভ মৃতবৎ বিশীর্ণ বিশ্ব-চমক-ই তুমি দেখ। তার খড়ি-ওঠা তিক্ত-কষায় পলেস্তরা স্বর্গীয় খাদ্য-পরিবেশক তোমাকে তোমার রুটির বিনিময়ে বিক্রি ক'রে দিয়েছে! এমন-ই তোমার দেবতাদের ধোঁকাবাজী! এর চেয়ে-ও বেশী তেতো অন্ধকারের অতলে তোমার প্রবেশ বা সর্বাঙ্গীন অবলোপ! কী রম্য ও আহামরি এই প্রকৃতি! সদা-পুঞ্জিত আশার কুহক, এক আপাত-গ্রাহ্য পরিকল্পিত চিন্তনের বুদ্বুদ, এক মনোরম প্রাসাদ-বিশাল মিথ্যা, এক নিত্য পূত জালিয়াতি! এই তো হ'ল প্রকৃতি—এক চরম ও প্রবল শক্তি এবং তার প্রকাশ্য মন্দত্বের নিয়ম! সত্যের প্রকাশ তাই সবচেয়ে কুয়াসাচ্ছন্ন ও অন্ধকার।[২]

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথের 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' জীবনের এ-ধরনের নেতিবাচক সমালোচনার চেয়ে মাত্র একধাপ এগিয়ে। প্রকৃতির উপর শোধ নিতে আগ্রহী নায়ক সন্ন্যাসী মানুষের অসংখ্য গৃহ ও বারংবার যাতায়াতের জায়গাকে সদা পরিবর্তন শীল বালুকাস্তূপের মতো ব'লে ভাবেন। বালুকা স্তূপগুলি সমুদ্রের শূণ্য আস্ফালনে যেন সদা-ই আহত। ক্লান্তিকর ও একঘেয়ে খাটুনির নোংরামি এবং হৈ-চৈ-করা মানুষদের প্রতি তাঁর নেই কোন মমত্ব-বোধ বা এপিকিউরীয়[৩] মুকুটধারী দেবতাদের মতো পাহাড়গুলিতে শয়ান ও মানুষের ব্যাপারে মাথা-না-ঘামানো উদাসীন্য। কেবল আছে এক কঠোর লুক্রেসীয় ব্যঙ্গ। সন্ন্যাসী অন্ধ প্রয়োজনের জগতের উর্ধ্বে, এক কুৎসিত-করুণ-হাস্যরসের রঙ্গমঞ্চের প্রভু। তিনি যেন এমন এক অগ্নিকাণ্ড ঘটাতে পারেন যা' প্রকৃতির এবং প্রাকৃতিক, মানুষ ও মানব-সুলভ, পৃথিবী ও পার্থিবকে অঙ্গার (দগ্ধাবশেষ, আবার জ্বালানো যায়) এবং ছাই-এ পরিণত ক'রতে পারে। এই ধরনের নায়ক (প্রকৃতির প্রতিশোধের সন্ন্যাসীর মতো) যিনি অদৃশ্য ও অশরীরীর বিরুদ্ধে, প্রকৃতি বা সমাজের শক্তির বিরুদ্ধে, অন্ধকারের শক্তি বা উচ্চতর শক্তির বিরুদ্ধে, স্বর্গ বা নরকের অধিবাসীদের বিরুদ্ধে লড়াই ক'রতে পারেন তিনি প্রতিটি আধুনিক আধিবিদ্যক নাটকের সর্বাপেক্ষা উল্লেখ্য চরিত্র। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথের 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'-কে আমরা পঠনীয় নাটকের (মঞ্চে উপস্থাপনা কি অসম্ভব ? অনু.) মধ্যে 'আধিবিদ্যক নাটক' (Metaphysical drama) আখ্যা দিচ্ছি। শ্রীযুক্তহেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বৃত্রসংহার' এবং 'দশমহাবিদ্যা'-কে আধুনিক মহাকাব্যের মধ্যে 'আধিবিদ্যক মহাকাব্য' আখ্যা-ই দিয়েছি।

আধিবিদ্যক খণ্ড মহাকাব্য আধুনিক চেতনা-শক্তিগুলির দ্বন্দের মধ্যে নিহিত একটি দার্শনিক অর্থ খুঁজে নিতে চেয়েছে। তেমন-ই আধুনিক আধিবিদ্যক নাটক-ও সেই এক-ই আধুনিক মননের সাহায্যে এক দার্শনিক দৃষ্টিতে কেন্দ্রীয় ট্রাজিক প্রশ্নটিকে বিচার ক'রছে। বলা বাহুল্য, এই ট্র্যাজেডির মূল কথা ব্যক্তি ও এক রহস্যময় অদৃষ্টের বিরুদ্ধে প্রাণপণ সংগ্রাম। ব্যক্তিময়তা ও অনিবার্য বাহ্যিক প্রয়োজনের মধ্যে উচ্চকোটির এই দ্বন্দ্ব ও সংঘাত (এ-ধরনের ট্র্যাজেডির প্রাণবস্তু)।

যেমন গ্রীক ত্রয়ীগুলিতে (Trilogies)[৪] কেবল এক বাহ্যিক নিয়তির প্রেতচ্ছায়া দেখি। ঘটনাসমূহ ঘটে যায় অপবিত্র এবং অপরাধের ছায়ায় (যা' পূর্ব-নির্দিষ্ট এবং শত চেষ্টাতে-ও অপ্রতিরোধ্য)। (আচার্য শীল এই

বহিরঙ্গ নিয়তি-র তুলনা ক'রেছেন খৃষ্টধর্মের 'আদি পাপ'-এর সঙ্গে)।[৬] শেক্সপীয়র এবং Calderon (ইনি-ও রচনার গভীরে এবং আকারে রোম্যান্টিক-ই)-এর রোম্যান্টিক ট্রাজেডিতে এক ফ্র্যানকেনস্টাইন-সুলভ দানবের দাপট দেখা যায়। গোপনচারী ও নির্বিবাদ এক অদৃষ্ট তার নিজের স্রষ্টার পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে চলে। নব্য-রোম্যান্টিক সাহিত্য-রচনায় নিয়তি হ'য়ে দাঁড়ায় ভাগ্য বা অদৃষ্ট। মহাকবি গ্যয়টে-ই প্রথম Nemesis-এর জায়গায় Fate[৭]—কে তুলে ধরেন। প্রাচীন গ্রীক নাটকের চিরায়ত এই নিয়তি-র কেবল বাহ্যিকতাকে অপেক্ষাকৃত আধুনিক রোম্যান্টিক ট্র্যাজেডিতে গোপনচারী ক'রে ব্যবহার করা হ'য়েছে। কিন্তু এর ফল ট্র্যাজেডির রস তথা উদ্দেশ্যকে ক্ষুণ্ণ করে। এক ভীতিজনক রহস্যময়তার সৃষ্টিকারী আবহ, যা' গ্রীক ট্র্যাজেডিতে বারংবার হানা দিয়ে যায় তা' নিয়তির এই অন্তর্লীনতার জন্য পরিস্ফুট হবার সুযোগ পায় না। গ্যয়টের সমস্যা ছিল রোম্যান্টিক ট্র্যাজেডির সারাৎসার, তার প্রগাঢ় গুরুত্বের সংযুক্তি এবং এর জটিল শারীর-গঠন—এক তমোময় ঘনাবর্ত ভীতিপ্রদ অদৃশ্য বাস্তব ঘটনা-সমুচ্চয় এবং শক্তি যা' ট্রাজেডির উচ্চকোটির উদ্দেশ্য ও প্রথম শ্রেণীর নান্দনিক উৎকর্ষ, উদ্দেশ্য ও আগ্রহ (যা' গ্রীক ট্র্যাজিক ট্রিলজিগুলির প্রাণ) তাকে রোম্যান্টিক ট্র্যাজেডিতে দুর্বল ক'রে ফেলা নিয়ে। গ্যয়টে তাঁর 'ফাউস্ট'-এ 'মেফিস্টোফিলেস' ও স্বর্গের দৃশ্যগুলির মাধ্যমে একে স্ফুটতর ক'রে তোলার চেষ্টা করেন (এবং অনেকখানি কৃতকার্য-ও হ'ন)। গ্যয়টের গভীর অনুরাগী ইংরেজ সাহিত্যিক শেলী ও বায়রন Prometheus Unbound, Manfred এবং Cain-এর মধ্যে অনুরূপ দৃষ্টিভঙ্গীর প্রকাশে প্রয়াসী হন। জীবন এবং মানব শক্তি, প্রকৃতির নিয়মাবলী ও জোরকে শিকল খুলে বন্ধন মুক্ত করা, যেন বিশ্বদৃশ্যকে উন্মোচিত ক'রে সবাই-কে হতচকিত করে। চমকে দেওয়া ঘটনাবলী ইত্যাদি ছিল অকস্মাৎ জীবন-নাট্যকে চালিত এবং আলোড়িত করা। অতিপ্রাকৃতের সর্বগ্রাসী শূন্যতা পূর্ণ হ'য়েছে মৃদু রহস্যময়তার কুহেলিতে, অদৃশ্য সারাৎসারে এবং গভীর-গম্ভীর বাস্তব বিষয়গুলি দিয়ে। এ গুলিকে মনে হয় মূক কোন দৃশ্যে মহড়া দেওয়ার মতো বিষাদাচ্ছন্ন কাহিনীর সঙ্কট-মুহূর্ত পার হ'য়ে যাবার পর পরিণতির দিকে কাহিনীর ক্রমশঃ গতি ব'লে। শৈল্পিক ভিত্তিতে যেমন বিদ্রোহীর স্বর্গ হ'তে বিতাড়িত হ'য়ে মর্ত্যে পতন—'স্বর্গ হ'তে বিদায়' (Milton-এর Paradise Lost প্রসঙ্গে বলা)।

Paracelsus[৮] এবং প্রকৃতির প্রতিশোধ দু'টি-ই এক একটি আত্মার বা জীবনের ট্র্যাজেডি। কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সাধারণ আধিবিদ্যক নাটক থেকে এ-দুটি ভিন্ন ধরনের। এদের মধ্যে দ্বিতীয়টিতে (অর্থাৎ, প্রকৃতির প্রতিশোধে) প্রকৃতি বা মানব-মনের স্বাভাবিক নিয়মের জোর, জীবন বা সমাজের কোন স্পষ্ট শক্তি—এ-গুলি-ই অদৃষ্ট অথবা অবশ্যম্ভাবী কিছুর নির্মাতা বা নিয়ন্ত্রক। এ-গুলিই (নাটক, উপন্যাস, কাব্য বা গল্পের) কথাবস্তুর (কাহিনীর of plot) একেবারে অন্তস্তল থেকে বহির্দেশে উন্মোচন ও নিয়ন্ত্রন ঘটায়। একটি বাস্তব অথচ অদৃষ্ট (শক্তি) এ-ভাবে ঘটনাবলীকে অভিতাড়িত ক'রে কথা বস্তুকে চরম দুঃখময় পরিণতির দিকে নিয়ে যায়। এ-জাতীয় নাটকগুলিতে অদৃষ্টের চালকরা নিজেরা-ই নাটকের চরিত্র হ'য়ে উঠবার পশ্চাৎ-পট হিসাবে কাজ করে না। Paracelsus এবং প্রকৃতির প্রতিশোধের মধ্যে প্রতিতুলনা ক'রলে প্রথমটি (অর্থাৎ Paracelsus) যে দ্বিতীয়টির চেয়ে অত্যন্ত বেশী

(আচার্য শীল 'immense superiority' শব্দ দু'টি ব্যবহার ক'রেছেন) ঋদ্ধ তা' স্ফুটতর হ'য়ে ওঠে। গভীর বুদ্ধিদীপ্ত অন্তর্দৃষ্টি, জীবনের নাটকীয় বিস্তার এবং জটিলতা, সামাজিক সমস্যা ও মানুষের পূর্ণতা অর্জনের সাধ, সাধ্য ও সাধনার পরিপক্ক বোধ এবং অস্তিত্বধারার সৃজনকারী বহুবিধ ও নানাদিকের শক্তি ও প্রবণতা-সমুচ্চয় বিষয়ে Paracelsus রচয়িতার পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রজ্ঞা বিশেষ ভাবে আমাদের মন ও মননকে আকৃষ্ট করে। প্রকৃতির প্রতিশোধের সন্ন্যাসীর-ই মতো Paracelus-ও সঙ্গে সঙ্গে এই পবিত্র জ্ঞান অর্জনের জন্য প্রয়াসী হন যে, এখানে ও ওখানে—বিশ্বের সর্বত্র অদৃশ্য হ'য়ে আছে অনেক কালের হারিয়ে-যাওয়া অথবা এক অদৃষ্ট-পূর্ব কোন কিছু! এই প্রচেষ্টার পুরস্কার হিসাবে দু'-জন-ই চান জগৎ, মানুষ ও তার সত্যিকার উদ্দেশ্য, তার জীবনের যথার্থ পথ অদৃষ্ট ইত্যাদির গোপনতম রহস্যকে জানতে। জনগণ ও জনতার থেকে সেই এক-ই বিবিক্তি, মানবজাতি সম্বন্ধে একই ধরনের বিশদ ঘৃণা, সেই একই রকমের জন-সাধারণের প্রতি রূঢ় অপমান ছুঁড়ে দেওয়ার অভীপ্সা দু-জনের মধ্যে-ই প্রকট। দু'-জনের মধ্যেই দেখি ভালোবাসা ও স্নেহের বন্ধনকে অবহেলা করার এক-ই মনোভঙ্গী। Paracelsus সর্বদা জিজ্ঞাসায় আচ্ছন্ন। কবি Aprile যখন শপথের ভঙ্গীতে ব'লে ওঠেন যে, তিনি ('জগৎ-জীবন-মানুষ-প্রকৃতি—সব কিছুকেই) অনন্ত ও অগাধ ভালোবাসা দেবেন এবং (বিনিময়ে) পাবেন সবার কাছে অনুরূপ ভালোবাসা তখন Paracelsus সবিস্ময় উক্তি করেন, 'হায়রে দাসানুদাস, সত্যি-ই আমি—আমিই তোমার রাজা।' (" poor slave, I am thy king indeed.") দু'টি ট্র্যাজেডিতে-ই জ্ঞান অথবা নিছক ভাবনা ও মননের ভালোবাসার উপর প্রভুত্ব-বিস্তারের প্রবল প্রযত্ন দেখা যায়। কিন্তু পরিণতিতে পরিস্ফুট হ'য়ে ওঠে এই বিবিক্তির ক্ষতিকর দিকটি। Paracelsus এবং সন্ন্যাসী উন্মাদ হ'য়ে যান এবং মৃত্যুর শিকার হন।

যদি-ও দু'টি আধিবিদ্যক নাটকের মূল প্রশ্ন একই এবং উত্তর-ও এক তবু এ-দু'টি নাটক সম্পূর্ণভাবেই দৃষ্টিভঙ্গী ও চিত্রণের দিক থেকে বিচার কর'লে ভিন্ন স্বাদের। Paracelsus এক সঙ্গে গোটা প্রজাতি (এ-জন্মের পরবর্তী প্রজন্মের নিজগোষ্ঠী বা মানব গোষ্ঠী)-কে সঙ্গে-সঙ্গে উন্নীত ক'রতে চান ব'লে-ই জানতে এত বেশী প্রয়াসী। সন্ন্যাসীর পরম সত্য-কে জানার ইচ্ছা প্রবল হ'লে-ও সম্পূর্ণই আত্মকেন্দ্রিক। জাতির (না, প্রজাতি?) জন্য ভালোবাসা—ভালোবাসা, আশা, ভয়, বিশ্বাস এককথায় মানবতার সারাৎসার Paracelsus-এর উন্মত্ততা কাটার পর মৃত্যুর যবনিকা নামার আগে মনে হয় সবচেয়ে উন্নত চিন্তা ব'লে। আসন্ন মৃত্যু তাঁর সামনে সত্যের গুণ্ঠন মোচন ক'রে দেয় এবং তিনি সন্তের মতো এক দিব্যদৃষ্টি পান। অমরতার চাবিকাঠি যে-জ্ঞান তার প্রতি পূজার অর্ঘ্য এবং সেই সত্যকে হস্তামলকের মতো জানার অদম্য ঈপ্সা তাঁর মধ্যে লক্ষনীয়। তাঁর জীবনের ট্র্যাজেডি মানবিক ভালোবাসার জন্য-ই।[৯]

অন্যদিকে বাংলা ট্র্যাজেডিতে প্রকৃতির সন্তানটির প্রতি কোমল মনোভাবের সঙ্গে সন্ন্যাসী যুদ্ধরত। হৃদয়ের গভীরে প্রোথিত জোর-ক'রে-বন্ধ রাখা এক পিতৃ-সুলভ স্নেহ-প্রবৃত্তির সঙ্গে-ই তাঁর নিরন্তর দ্বন্দ্ব। কোমল হৃদয়-বৃত্তির

সঙ্গে সন্ন্যাসীর এই দ্বন্দ্ব নিতান্তই ব্যক্তিগত। এই দ্বন্দ্ব গোটা জাতির জন্য অসীম জ্ঞান ও অগাধ ভালোবাসার উচ্চ পর্যায়ে ওঠে না। Paracelsus-এর দ্বন্দ্ব এই পর্যায়ের প্রতিনিধিত্ব ক'রেছে। ১০

যদি নব্য-রোম্যান্টিক নাটক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিল্পের নিতান্ত-ই ব্যক্তি কেন্দ্রিকতাকে অতিক্রম না ক'রতে পেরে থাকে, জীবনের নেতিবাচক সমালোচনার দিক (বিলীয়মানতা) বিষয় এবং জ্ঞাতার (বিষয়ীর) দ্বন্দ্বের স্থান ক'রে দেয় এবং তা' ব্যক্তিক প্রয়োজনের স্বভাবকে অতিক্রম না ক'রতে পেরে থাকে এবং জ্ঞান ও ভালোবাসা, অথবা প্রজ্ঞা ও প্রেমের দ্বন্দ্ব-কে ঊর্ধ্বচারী না ক'রে থাকে—সামাজিক জীবনের বাস্তব প্রয়োজন থেকে তা' দূরে-ই স'রে থাকে অথবা সুদূর হ'য়ে থাকে মানবজাতির আদর্শ পূর্ণতা লাভের সামর্থ্য তথা মানবীয় প্রোৎসাহকে উজ্জ্বলতর না করে তবে নিতান্তই ব্যক্তিক মনস্তত্ত্বের দৃষ্টিতে-ই বিচার্য হয় তাঁর 'প্রভাত সঙ্গীত' ও 'সন্ধ্যা সঙ্গীত'। সেই একই ধরনের একান্ত বিবিক্ত ব্যক্তিক সীমাবদ্ধতা এ-দুটি কাব্যগ্রন্থে-ও লক্ষণীয়। ক্রমহ্রাসমান অথবা বিলীন আলোক, উদীয়মান ও অস্তসূর্যের শেষ রশ্মিপাত কবির আত্মার গহনে ভেসে ভেসে আসে—ধূসর আকাশের মাঝে লূতাতন্তুর মতো, মহাব্যোমের প্রতি এক সুতীব্র প্রীতি ও নিদ্রাতুর আচ্ছন্নতা—অপসৃয়মান ছায়া-ছায়া ভাবনা আনে তাঁর মনে। এক ঘুম-ঘুম অলস আনন্দ, ভালোলাগা ও অগ্নিদীপ্ত পূর্বতন জীবনের গোধূলি-ধূসর স্মৃতি, অশরীরী ঔজ্জ্বল্যের গতায়াত অথবা হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে উৎসাহিত হয়ে ওঠা—এইসব ছবি আমাদের মনে-ও সঞ্চালিত ক'রে এঁকে দেওয়া ও সেগুলিকে স্ফটিকের মতো অনেক পাতা জুড়ে রুপোর পাড় বসানোর মতো বিশ্লেষণী দৃষ্টিতে কোমলভাবে তুলে ধরা। অতি সূক্ষ্মভাবে বয়ন করা বিভিন্ন ধরনের কল্পনারাশির এক সংশ্লেষণ। এই সঙ্গীতগুলিতে বাংলা কবিতা নব্য-রোম্যান্টিক গীতিকবিতার উচ্চস্তরে উঠে আসে।

টীকা

১। আচার্য শীল চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের লেখা 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম' নামের উপন্যাসটিকে নব্য-রোম্যান্টিক সাহিত্যের মধ্যেই গণ্য ক'রেছেন। বাকাগুলি সেই প্রসঙ্গেই বলা। 'Rhå'psodẙ' শব্দটির আভিধানিক অর্থ—প্রাচীন গ্রীক মহাকাব্যের খণ্ডাংশে গেয়; উদ্দীপ্ত বা আনন্দ-বিহ্বল; আবেগ-বিহ্বল সঙ্গীত। সংসদের E to B অভিধান। COD p 894 (Edn. of 1983) অনুসারে Rhå'psodẙ-n. enthusiastic extravagant utterance or composition; emotional irregular piece of music. Etc. অ্যারিস্তোতলের Poetics-এ 'রাপ্‌সোদিআ' শব্দটি সংসদের E to B অভিধানের প্রথম অর্থটিতেই বহুল-ব্যবহৃত। চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের এই লেখাটি অনুবাদকের দেখা-ই নেই, পড়া তো দূরের কথা। তাই এর কথাবস্তু ও পরিবেশন-ভঙ্গী বিষয়ে আচার্যকেই মানতে হ'চ্ছে।

২। বিশেষণ-সর্বনাম কন্টকিত ইংরাজি পূর্ণ বাক্যগুলি ১ সংখ্যক পাদটীকার রচনা সম্পর্কে লেখা। এখনকার সাহিত্য-সমালোচনায় নেতিবাচক দিকটিকে প্রকাশ করার ভঙ্গী এমন দেখা যায় না। লেখকের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য দর্শন ও সাহিত্য-সমালোচনের যৌথ পথে এখানে পরিচালিত তো বটেই, সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর প্রকাশ-ভঙ্গীর কাব্যিক ভাবটি-ও স্পষ্ট। আজকের দিনে এ-ধরনের বাক্য-সমাবেশ অনেকের কাছেই বাক্-বাহুল্য মনে হবে। লেখাটি-ও শতবর্ষ অতিক্রম ক'রল। তাছাড়া, সকলের-ই চিন্তা-প্রকাশের বিভিন্নতা দেখা যায়। লেখাটি পাণ্ডিত্যে আচ্ছন্ন এবং খুব স্পষ্ট নয়। তবু মনে রাখতে হয় যে, লেখকের বয়স তখন ২৩ থেকে ২৬-এর মধ্যে।

৩। Epicuros-প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক। (৩৪১-২৭০ খৃ. পূ.) জড়বাদী দার্শনিক 'লিউকিপ্পস' এবং দেমোক্রো-তোসের পরমাণুবাদের পুনরুজ্জীবন ঘটান এবং নিজস্ব মৌলিক চিন্তার-ও প্রয়োগ করেন। নিরীশ্বরবাদী এই দার্শনিক দুঃখকে এড়িয়ে ব্যক্তির মানসিক স্বচ্ছ ও শান্তিপূর্ণ জীবনানন্দকে-ই গ্রহণ করা উচিত এই নৈতিক মতবাদের প্রবক্তা। তিনি একটি সম্প্রদায়-ও গড়ে তুলেছিলেন।

৪। LuKretius (আনুমানিক ৯৯-৫৫ খৃ. পূ.)—একজন জড়বাদী দার্শনিক ও রোমান কবি। এপিকিউরসের দর্শনের অনুরাগী। মৃত্যু, দেবতা ইত্যাদির ভয় ভুলে সমাজের ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে থেকে আনন্দ ও শান্তিকে খুঁজে পেতে হবে। আত্মা ও মরণশীল এ-মতের পরিপোষক। জীবনের এক জীবন্ত জড়বাদী ব্যাখ্যাকার। রোমক সংস্কৃতির জগতে তাঁর চিন্তার দান অপরিমেয়। তাঁর লেখা কবিতাগুলি রোমের নবজীবনের পথ প্রদর্শক ছিল। দর্শন-চিন্তা তাঁর কাব্যে প্রকট এবং সেই চিন্তা জড়বাদী ও প্রায় এপিকিউরীয় নীতির-ই মতো। এপিকিউরস ও লুক্রেসিয়স-কে প্রায়শঃই অত্যন্ত ভুল বুঝবার প্রবণতা আমাদের মধ্যে অনেকের-ই আছে।

৫। কোন-কোন ট্রিলজি (ত্রিলোগি) তা' বলা নেই। আছে কেবল একটি-ই সামান্যীকৃত শব্দ 'ট্রিলজিগুলি'। 'আয়স্খুলোস', 'এউরিপিদেস' না 'সোফোক্লেসের' রচনা তা-ও বলা নেই। বোধকরি সব গ্রীক-ট্র্যাজেডি সম্বন্ধে এটি এক সামান্যীকৃত উক্তি। 'আরিস্তোতোলোস' ট্র্যাজেডির মধ্যে গম্ভীর ও মহৎভাব (স্পোউদাইঅস্) দেখে এটাকে-ই সবচেয়ে প্রিয় ও গ্রহণযোগ্য ব'লে মনে ক'রেছিলেন। গ্রীক ট্র্যাজেডি রচয়িতাদের মধ্যে 'আয়স্খুলোস, এউরিপিদেস এবং সোফোক্লেস' বিশেষ পরিচিত। কিন্তু প্যারডি-রচয়িতা 'হেগেমোন' উর্বরতার দেবতা (ফাল্লোস)-কে কেন্দ্র ক'রে নিম্নশ্রেণীর মানুষের (ফাউলব) ফাল্লিক-গীতি, রঙ্গব্যঙ্গ (ইআমুবোস) ইত্যাদির উল্লেখ ক'রতে ভোলেন নি। ট্র্যাজেডি-প্রসঙ্গে আলোচনা ব'লে-ই বোধকরি আচার্য (রাপ্সোদিআ) -র উল্লেখ মাত্র ক'রেই ক্ষান্ত হ'য়েছেন।

৬। আদিপাপে যেমন ঈশ্বরের আদেশের অবমাননা ও তাঁকে উপেক্ষা করার মনোভাব আছে তেমন। কিন্তু কথা এই যে, আদি-পাপ নিয়তি-তাড়িত ছিল না, ছিল শয়তান-চালিত। আচার্য শীল কি ঈশ্বরের আদেশের লঙ্ঘন এবং প্রতিকূল আচরণকে-ই কেবল নিয়তির (Nemesis) সঙ্গে তুলনা ক'রছেন, না, অন্য কোন গভীরতর অর্থে এ-তুলনা আনছেন? এ-প্রশ্ন-ও সুধীরা বিচার ক'রে দেখবেন।

৭। 'নেমিসিস'-কে আমরা অন্যায়ের প্রতিবাদে অধিষ্ঠাত্রী গ্রীক দেবী ব'লে জানি। কিন্তু পৃথকভাবে এই নামের প্রাচীন কোন দেবী ছিল অথবা 'The Fates'—ক্লোথো লাথেসিস এবং আথ্রোপোস (Clotho, Lachesis ও Athropos)-মানুষের জন্ম-জীবন ও মৃত্যু-নিয়ন্ত্রণকারিনী গ্রীক ভাগ্য দেবীত্রয়-কে- এই নামে অভিহিত করা হ'ত তা' সুধীরা ব'লবেন। সোফেক্লেসের 'ওয়দিপৌস' নাটকে আপোল্লোন এর স্তুতি, শেষভাগে তাঁকে ডেকেই অন্ধ রাজা 'ওয়দিপৌসের' বিলাপ শুনি। আয়য়াস্ বা আন্তিগোনে-তে ঠিক এমনটি নয়।

৮। ব্রাউনিং রচিত কাব্যগ্রন্থ Paracelsus চরিত্রকে কোন বিশেষ এবং গভীর অর্থে আচার্য শীল ব্যবহার ক'রেছেন কিনা তা' বিজ্ঞজনদের বিবেচ্য। এটিকে ঘিরে নানা পুরাণ-কথা-ও তো আছে।

৯। প্রথমত : 'Race' শব্দটি প্রজাতি বা সমগ্র মানব জাতি বা বিশেষ কোন গোষ্ঠীকে বুঝাচ্ছে কি না তা অনুবাদক ও টীকাকারের কাছে স্পষ্ট হ'ল না। সুধীদের ভাবতে অনুরোধ করি। দ্বিতীয়তঃ দু-জনেরই প্রশ্ন ও উত্তর এক-ই বলার পর এবং Paracelsus-এর-ও স্নেহ-ভালোবাসার 'পর প্রবল বিতৃষ্ণার কথা বলার পর-ও আচার্য মৃত্যু-ঘোরে আচ্ছন্ন Paracelsus শেষ উপলব্ধিকে-ই আশ্রয় করেছেন। 'পরস্পর-বিরোধী' বলেন নি। সন্ন্যাসী এমন উক্তি করেন নি ব'লেই প্রকৃতির প্রতিশোধে এই ধরনের বক্তব্য সুপ্ত আছে এটার বিবেচনা আচার্য কেন যে করেন নি তা' বুঝতে অনুবাদক অসমর্থ। সাহিত্য-বিষয়ে এবং সাহিত্যের ভিতরে সুপ্ত দার্শনিক ভাবনাকে বুঝতে যারা পারঙ্গম তাঁদের এ-বিষয়ে বিচার ক'রে দেখতে সবিনয় অনুরোধ ক'রছি। পরবর্তী অনুচ্ছেদে তিনি যা' ব'লেছেন তা' প্রকৃতির প্রতিশোধ নাটকটির প্রতি সুবিচার ব'লে মনে হ'চ্ছে না। সন্ন্যাসী বালিকার মৃত্যুতে ফিরেছেনও।

১০। আচার্যের গ্রন্থটির প্রকাশ ১৯০৩ সালে। এর বহু বছর আগে (১৮৮৮-৯১-এর মধ্যে-ই) রবীন্দ্রনাথের 'বউ ঠাকুরানীর হাট', রাজর্ষি ইত্যাদি উপন্যাস প্রকাশিত হ'য়েছিল। বউ ঠাকুরানীর হাটে প্রতাপাদিত্যের বড় ছেলের সাধারণ প্রজাদের প্রতি অগাধ প্রীতি ও বসন্ত রায়ের রাজ্যে 'সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে'-এর মনোভাব প্রতি প্রজার। সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোর ব্যবস্থার মধ্যে-ও রাজপুত্র এবং বসন্ত রায়ের মধ্যে মানব প্রেমই স্পষ্ট, নিতান্ত ব্যক্তিক চিন্তন নয়। রাজর্ষি উপন্যাসে মানব-প্রীতি ছাড়া-ও একই প্রকৃতির সন্তান (বলি — মানুষ এবং পশু)-দের প্রতি প্রীতি বড়-ই স্পষ্ট। এই মানুষ ও সর্বজীবের প্রতি প্রেম রাজার মনে সঞ্চার ক'রে দেয় যে বালিকা তার নামটি-ও তাৎপর্যপূর্ণ : হাসি। তাতা (পরে ধ্রুব)-কে হারিয়ে রাজ্য হারিয়ে রাজা গোবিন্দ-মাণিক্য সবার প্রতি তাঁর প্রেমের বিস্তার ঘটান। সব বালকের মধ্যে-ই তিনি ধ্রুব-কে দেখে তাদের প্রতি ধ্রুব-স্নেহ বোধ করেন। প্রতিহিংসা-পরায়ন রঘুপতি পর্যন্ত অনন্ত প্রেমের রাজ্যের সন্ধান পান। তিনি তা' কেবল জয়-সিংহকে হারিয়ে-ই তা' পান নি। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার উদ্বর্তন বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে ঘটেছে। প্রকৃতির প্রতিশোধে যা' স্পষ্ট ক'রে বলেন নি তা' কিন্তু রচনাটিতে সুপ্ত আছে ব'লেই অনুবাদকের বোধ হ'য়েছে। এ-বিষয়ে অনুবাদক একমত হ'তে পারছেন না। সুধীদের আর-ও গভীর আলোচনা পাঠ ক'রতে পেলে হয়তো বা এই মতান্তর হ'ত না। বিজ্ঞজনের বিশেষ ভাবনা অনুবাদকের অজ্ঞতা দূর ক'রবে ব'লে আশা ও ভরসা রাখি।

——

পরিশিষ্ট-২

কবি দীনেশ গঙ্গোপাধ্যায় ও তাঁর কবিতা

আমাদের এই মহাবিদ্যায়তনের একজন প্রাক্তন ছাত্র ছিলেন কবি দীনেশ গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর জন্ম ঢাকা বিক্রমপুরের ইছাপুরা গ্রামে, বাংলা ১৩১৩ সনের ১১ই ভাদ্র, ইংরেজী ১৯০৫ সনের ২৮শে আগষ্ট। তাঁর স্কুলজীবন কাটে দিনাজপুরে ও কলেজজীবন কোচবিহার ভিক্টোরিয়া কলেজে। কবির প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয় তিরিশের দশকের গোড়ায়, সচ্চদানন্দ ভট্টাচার্যের 'বঙ্গশ্রী' পত্রিকায়। আত্মপ্রচার-বিমুখ ও বিষয়-উদাসীন এই কবি সারাজীবনে যা লিখেছেন তার খুব অল্পই গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর প্রথম গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৯৪৫ সালে, 'তেইশে জানুয়ারী' নামে দেশাত্মবোধক কবিতার সঙ্কলন, প্রকাশক উষা পাবলিশিং হাউস। দীর্ঘ ১৩ বছর পরে তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'কাগজের নৌকা' ১৯৫৮ সালে ভারতী লাইব্রেরী থেকে প্রকাশিত হয়। তারপর ১৯৬৪ সালে ঐ ভারতী লাইব্রেরী থেকে বেরোয় কিশোরদের উপযোগী কবিতার সঙ্কলন 'যাদুঘর', প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালে পঁচিশী সাহিত্যবাসর থেকে কাব্যগ্রন্থ 'স্মৃতির সোনার পদ্ম' এবং ১৯৮৪ সালে, কবি মারা যাবার মাত্র ৭ মাস আগে, এ মুখার্জি অ্যাণ্ড কোম্পানি থেকে ভ্রমণ কাহিনী 'বিতস্তার দেশে'। মাঝে ১৯৬৭ থেকে ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত এ, কে, সরকার কোম্পানি তাঁকে দিয়ে ছোটদের উপযোগী কিছু অনুবাদের কাজ করিয়েছিলেন। বইগুলির নাম ছিল গ্যালিভার্স ট্র্যাভেল্স, রবিনসন ক্রুশো, রবিনহুড, ডেভিড কপারফিল্ড, অলিভার টুইস্ট এবং সুইস ফ্যামিলি রবিনসন। অনেক প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক ও প্রকাশকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকা সত্ত্বেও কবি তাঁর পাণ্ডুলিপি মুদ্রণের জন্য কখনও কারও দ্বারস্থ হন নি। তাই 'পাকিস্তানের পাঁচালী' ও 'রামরাজ্য'-র মত দুটি দীর্ঘ কবিতার পাণ্ডুলিপি, যা কবি চল্লিশের দশকের শেষের দিকে লেখা শেষ করেছিলেন, অপ্রকাশিতই থেকে গেছে। ও দুটি দীর্ঘ কবিতা কোন পত্র পত্রিকাতে পর্যন্ত কখনও প্রকাশিত হয় নি। অথচ মোহিতলাল 'ভগ্নদূত' পত্রিকার সম্পাদক বীরেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরীকে এই দুটি কবিতা সম্পর্কে লিখেছিলেন : "একজন খুব শক্তিশালী কবির সন্ধান পাইয়াছি। তিনি পাকিস্তানের পাঁচালী ও রামরাজ্য নামে যে দুইটি দীর্ঘ কবিতা লিখিয়াছেন তাহা শুনিলে মুগ্ধ হইবে।" মোহিতলাল এ দুটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলে তাদের ভূমিকা লিখে দেবারও প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

কবির মৃত্যু ঘটে ১৯৮৪-র ১৩ই জুলাই, ৭৯ বছর বয়সে, এস, এস, কে, এম হাসপাতালে, গুরুতর অসুস্থ হয়ে কয়েকদিন শয্যাশায়ী থাকবার পর। আমরা এখানে কবি দীনেশ গঙ্গোপাধ্যায়ের দুটি কবিতা মুদ্রিত করছি।

——::——

ইতিহাস

এখানে একদিন একটি মন ছিলো
যে মনটি খুশী ছিলো অল্পে,
যে মনটি মরমিয়া, অনায়াসে ভরতো
সহজিয়া রূপকথা, গল্পে।

এখানে একদিন একটি মাঠ ছিলো
সেই মাঠে ধানশিষ দুলতো,
একটি ঘর ছিলো, দেয়ালে আলপনা
চালভরে 'লাউ-লতা ঝুলতো।

একটি নদী ছিলো, বিগলিত তৃপ্তি
যার কূলে ভিড়তোনা তৃষ্ণা,
একটি মেয়ে ছিলো, সোহাগী সোম-লতা
আদরের ডাক নাম কৃষ্ণা।

একটি পাখি ছিলো নীড়ের সুখে সুখী
মিষ্টি সবুজ সুরে ডাকতো,
একটি ফুল ছিলো, বাহারী বনফুল
গন্ধে বিভোর করে রাখতো।

একটি রস ছিলো, তুষ্টির সুধারস
প্রাণের গভীরে তার তৃপ্তি
অভাব-বোধহীন দুর্লভ হৃদয়ের
প্রসন্ন সুন্দর দীপ্তি।

আজ সেই মন নেই, সহজের রঙ নেই
নেই সেই স্বভাবের শান্তি,
শান্তির নাম আজ ভ্রান্তির বালুচরে
আলেয়ার পিছে-ঘোরা শ্রান্তি।

নেই সে সহজ সুখ, সহজে ভরেনা বুক
খুশী আর হয়না সে অল্পে
জটিলের ঘূর্ণিতে কুটিল আঁধির ঝড়
আজ তার হৃদয়ের গল্পে।

কাঁচা মাটি পুড়ে ছাই, সে নদীটি বেঁচে নাই
মরে গেছে মায়াবিনী কৃষ্ণা
মায়া আজ মরীচিকা : ছায়া-হারা জীবনীতে
তৃপ্তির নব নাম তৃষ্ণা।

পাখিরও পুড়েছে পাখা, ফুলটি পাথর চাপা
তুষ্টি, সে তুষানলে জ্বলছে
প্রশান্ত মহাকাল উত্তাল বিকারের
আগ্নেয় হলাহলে টলছে!

এপ্রিল / ১৯৫১

পাথরের চোখ

অনেক সন্ধ্যা অনেক সকাল স্বপ্ন-প্রদীপ জেলে
বুক পুড়ে পুড়ে ছাই হয়ে গেলো কালো শহরের 'সেল'-এ।
তবু চোখ দুটি রেখে আজও ঐ পূব জানালার দিকে
চেয়ে থাকি রোজ সেই নিভে-যাওয়া আকাশ-দীপের দিকে।

কি দিয়ে জ্বালবো ওরে পোড়া মন, সে প্রদীপ পারো বলতে ?
আশা-পিলসুজে পালিশ ঘষছি : নেই তেল, নেই সলতে।

চোখের ভুবনে অমানিশা তাই এ ভুবন আলোহারা
চেয়ে থাকা মিছে : ছাই-হওয়া মন সেও তো ভস্ম-তারা :
তবু সে তারার বন্ধ্যা দুয়ারে বৃথা আজো বার বার
মাথা কুটে মরি। একফোঁটা আলো কেউ তো দেয়না ধার।

দুটি পাথরের চোখ ভরে কবে আলো পাব পার বলতে ?
আশা-পিলসুজে পালিশ ঘষছি : নেই তেল, নেই সলতে।

নিষ্ফলা এই মরুনীলিমায় নীলপদ্মের কুঁড়ি
ফুটবেনা আর জানি, তবু তার মাধুকরী নিয়ে ঘুরি।
আশার সোনালী জরি-সুতোটিরে স্বপ্নের সুচে ভরে
ছেঁড়া আকাশের বিবর্ণ ত্বক মরি শুধু রিপু করে'।

খসে খসে পড়ে জীর্ণ জমিন, সুচ পারেনাকো চলতে,
আশা-পিলসুজে পালিশ ঘষছি : নেই তেল, নেই সলতে।

৩০-১০-১৯৫৬

একটি চিঠি

13-2-89
B: 13/57, Sonarpure
Varanasi—I (U.P.)
Pin—221001.

পরম শ্রদ্ধাপদেষু,

আপনার ২৫ | ১২ | ৮৮ তারিখের পত্র যথা সময়ে পেয়েছি। আমি কোচবিহার কলেজে পড়েছি ১৯১২-১৯১৪ সনে মাত্র এই দুই বৎসর। আমার সহপাঠী দিগের মধ্যে আমার পরিচিত একজন বাদে সকলেই ওপারে চলে গেছেন। যে একজন বেঁচে আছেন তার নাম শ্রী অখিলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী B. E. তিনি তার ছেলে সুনীল কুমার চক্রবর্ত্তী B. E.-র কাছে আছেন।

তিনি বর্তমানে আমার চেয়েও অশক্ত। নিজে চিঠি লিখতেও পারেন না। আমরা যে বৎসর ঐ কলেজে ভর্ত্তি হই সেই বৎসর ডাঃ শীল কলিকাতা University তে Head of the Philosophy Department হয়ে চলে যান। আমার সহপাঠী কোবিহার নিবাসী ৺তারাপদ মুখার্জ্জী জজ হয়ে ছিলেন। তাঁর কয়েকটি ছেলে এখনও ঐ শহরে তাদের বাড়ীতে আছেন। আমার অন্য এক সহপাঠী ৺হৃদয় লাহিড়ী রংপুর কলেজে প্রফেসর হয়েছিলেন।

ডাঃ শীলের বিষয়ে অনেক গল্প শুনেছি। Sri P. C. Roy তার Hindu Chemistry লেখার জন্য ডাঃ শীলকে যে কাগজ পত্র দিয়াছিলেন তিনি সেই সব কাগজ নিয়ে এসে লেখাপড়া করে সমস্ত রাত্রি শেষ করে দিয়েছেন এ কথা প্রফেসর ৺শ্যামাচরন চক্রবর্ত্তীর মুখে আমি শুনেছি। একবার কবি কালিদাস রায় কলিকাতায় ডাঃ শীলের সঙ্গে দেখা করিতে গেলে তাকে দেখেই তিনি তার লেখা একটি পদ্য যার প্রথম লাইন হচ্ছে

"নন্দপুর চন্দ্র বিনা বৃন্দাবন অন্ধকার,
চলে না চল মলয়ানিল বহিয়া ফুলগন্ধ ভরে।"

এই পদ্যটা আবৃত্তি করে ঐ কবিকে শুনাইয়া দিয়াছিলেন। পরে কবি তার সহ কর্ম্মীদের ঐ ঘটনা বলেন। ডাঃ শীলের সম্বন্ধে আরও অনেক তথ্য অনেকেরই জানা ছিল।

আপনাদের এই মহতী চেষ্টা সফল হউক ইহাই প্রার্থনা করি। নিবেদন ইতি—

শ্রী রমানাথ ঘোষ

পরিশিষ্ট—৩

আমার কলেজ জীবন ঃ কিছু স্মৃতি চারণ ও অনুচিন্তন

শ্রীপ্রহ্লাদ কুমার সরকার
রিডার, দর্শন বিভাগ, ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, সম্পাদক, 'দর্শন ও সমাজ'।

। প্রাক্‌কথন ।

আমি মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণ উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ১৯৫৮ সালে তৎকালীন মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ভিক্টোরিয়া কলেজে ছাত্র হিসেবে যোগদান করি। বিদ্যালয়ের শেষ বছরটিতে আমাদের ক্লাস হতো রাস্তাসংলগ্ন একটি ঘরে। উন্মুক্ত গবাক্ষের বাইরে কলেজ গমনাগমনকারী ছাত্র-ছাত্রী ও অধ্যাপকেরা আমাদের দৃষ্টিকে বহিমুর্খী করে তুলতেন। অনাগত ভবিষ্যতের কল্পনায় মন ভরে উঠত অপার বিস্ময়ে ও অনির্ণেয় কৌতূহলে। কলেজে যোগদান করবার পর কল্পনা ও বাস্তবের সংঘাত দেখা দিলেও পরিণত কৈশোর ও সমাগত যৌবনের সন্ধিক্ষণে কল্পনার রঙ্গীন প্রচ্ছদ সম্পূর্ণভাবে অপসারিত করা সম্ভব ছিল না। তাই এই সময়ে জীবন যেন সাধনা ও সিদ্ধি, লক্ষ্য ও উপলক্ষ এবং সর্বোপরি, আদর্শ ও বাস্তবের, বিপরীত মেরুকে ভর করে দোলায়িত হতো। অনুচিন্তনে পুরনো জীবনের স্বপ্নঘন কল্লোল অনুরণিত না হলেও, এখনও এর দুর্নিবার প্রভাব অনুভব করি আত্ম-সত্তার সর্বস্তরে।

তখনকার শিক্ষাক্রমে অনুযায়ী আমার কলেজীয় শিক্ষা চতুর্থ বছরে, অর্থাৎ ১৯৬২ সালে, শেষ হবার কথা। কিন্তু শেষ দুই বছরে (১৯৬১ ও ১৯৬২) প্রতিবাদী ছাত্র-রাজনীতির অন্যতম সক্রিয় পরিচালক হওয়ায় ও শারীরিক অসুস্থতার কারণে কলেজের সংগে আরও এক বছর জড়িত থাকি। এ সময়ের অনুপল পরম্পরার আনুপূর্বিক কেনে বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়, সম্ভব নয় সকল ঘটনা ও সমকালীন বিভিন্ন চরিত্রের অনুপুঙ্খ বর্ণন। আমার সময় আমার আত্মঅভিজ্ঞতার আলোকে অর্থবহ। অন্যভাবে বলতে গেলে, আমার সময় আমার অতিবাহিত অভিজ্ঞতা। এই অভিজ্ঞতা এক ঐতিহ্যমন্ডীত প্রতিষ্ঠানের, সমকালীন বিভিন্ন চরিত্রের ও ঘটনা প্রবাহের।

। সুদৃশ্য ইমারত ও পরিবর্তনশীল পটভূমি ।

কলেজের পুরনো সুকারুকার্যমন্ডিত ইমারতটি পরিবর্তনশীল পটভূমিতে অনেকটা নিষ্প্রভ হলেও এখনও তা অনুসন্ধানীর নান্দনিক অনুভূতি ও বোধকে পরিতৃপ্ত করে। বিদ্যালয়ে পড়বার দিনগুলিতে রাস্তার পাশের লম্বা বাড়ীটি তৈরী হতে দেখি। এখানেই রসায়ন বিজ্ঞান বিভাগ স্থানান্তরিত হয়। আই, এ, পড়বার সময় এখানকার গ্যালারীতে নিয়মিত ক্লাস করেছি। অধ্যক্ষের ঘরের সীমানা পেরিয়ে পুরনো টিনের ছাউনী দেওয়া ঘরে অন্যান্য ক্লাস হতো। মূল বাড়ীর দুই প্রান্তের গ্যালারীতেও ক্লাস হতো অল্পস্বল্প। কলেজের গ্রন্থাগারটি ছিল এই বাড়ীর ঠিক মাঝখানে। জীববিজ্ঞান বিভাগ সংলগ্ন মাঠটিতে মরসুমী ফুলের চাষ হতো। শিক্ষকদের বিশ্রামাগার ও বড় রাস্তার মধ্যবর্তী জায়গায় ছিল একটি টেনিস কোর্ট। কখনও কখনও ওখানে ব্যাডমিন্টন খেলা হতো। বর্তমান গ্রন্থাগারটি তৈরী হয় সম্ভবত ষাটের দশকের প্রায় মাঝামাঝি। গ্রন্থাগারের ও হোস্টেলের পিছনে ছিল স্বপরিচালিত একটি ক্যান্টিন। রয়াসন বিভাগের বাড়ী ও বর্তমান গ্রন্থাগারের সামনের মাঠটিতে ক্রিকেট খেলা হতো প্রায় নিয়মিত। এই মাঠের সাংবৎসরিক প্রতিযোগিতামূলক স্পোর্টস-এর অনুষ্ঠান সকলকে আকর্ষণ করতো। এন, সি, সি,র জন্য এখানেই আমাদের জমায়েত হতে হতো।

। নৈষ্ঠিক অধ্যাপকমণ্ডলী ।

যাঁদের সাহজিক সান্নিধ্য না পেলে আমার বৌদ্ধিক জীবনের উদ্বর্তন অসম্ভব হতো, সেই নৈষ্ঠিক অধ্যাপকদের কথা সবচেয়ে বেশি স্মরণ করা দরকার। ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপকরূপে যাঁদের কাছে পাঠগ্রহণ করেছি তাঁরা হলেন ঃ ডঃ শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী যোগেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য, শ্রীসুভাষ দত্ত ও শ্রীনারায়ণ চন্দ্র সাহা। ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় কৃশ, দীর্ঘকায় অথচ ঋজু শারীরিক কাঠামোযুক্ত মানুষ ছিলেন। তাঁর রাশভারী ও পরিমিত আচরণ অধ্যেতীবর্গের মনে শ্রদ্ধার উদ্রেক করতো। পরবর্তীকালে তিনি হুগলী মহসীন কলেজে বদলি হন এবং বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। অধ্যাপক ভট্টাচার্য অত্যল্পকাল আগে ক'লকাতার ইনষ্টিটিউট অব ইংলিশ-এর কর্মাধ্যক্ষরূপে কর্তব্যরত অবস্থায় লোকান্তরিত হন। তিনি ক'লকাতা ও রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন। তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র, শ্রী চিদানন্দ ভট্টাচার্য, বর্তমানে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের অধ্যাপনা কর্মে নিযুক্ত আছেন। অসাধারণ স্মৃতিশক্তির অধিকারী ও সুবক্তারূপে তাঁর বিশেষ খ্যাতি ছিল। অধ্যাপক দত্ত ও অধ্যাপক সাহা বিষয় বস্তুর সহজবোধ্য বিশ্লেষণ ও উপস্থাপনায় বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতেন!

বাংলা বিভাগের বয়োজ্যেষ্ঠ অধ্যাপক ছিলেন শ্রীদেবেন্দ্র কুমার ঘোষ। বিষয়বস্তুর আলোচনায় তিনি পূর্বপ্রস্তুতির পরিচয় দিতেন। সুনির্বাচিত শব্দ চয়নে ও সুগভীর ভাবপ্রকাশক শব্দগ্রন্থনে তিনি ছিলেন যথেষ্ঠ পারদর্শী। অনাড়ম্বর ঐতিহ্যবাহী চরিত্রের এরূপ মানুষ দুর্লভ। শ্রীভবানীগোপাল সান্যাল ও শ্রীঅমরেন্দ্র নাথ দত্ত আমাদের সময়েই এই বিভাগে অধ্যাপকপদে যোগদান করেন। অধ্যাপক সান্যাল পরে বারাসাত ও মৌলানা আজাদ কলেজে কর্মরত থাকা অবস্থায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগেও অধ্যাপনা করেন।

ইতিহাস বিভাগে অধ্যাপক হিসেবে অধ্যয়নের সুযোগ লাভ করেছি অধ্যক্ষ চন্ডিকাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে যিনি ছিলেন প্রখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র। পরবর্তীকালে তাঁকেও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপকরূপে কর্মরত দেখেছি। ইতিহাস অধ্যয়নে আমার মনে তারুণ্যের জোয়ার এনে দিয়েছিলেন অধ্যাপক কমল কুমার ঘটক। এই সুযোগ্য অধ্যাপক বর্তমানে ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রিডার পদে নিযুক্ত আছেন। তাঁর অনুধ্যাত ও সুপরিকল্পিত বিষয়বস্তুর উপস্থাপনা আমার কাছে ইতিহাসকে অধ্যেতব্য বিষয়রূপে আকর্ষণীয় করে তোলে। অধ্যাপক শ্রীকল্যান কুমার সেনগুপ্ত প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের আলোচনায় যথেষ্ঠ পান্ডিত্যের পরিচয় রাখতেন। বর্তমানে অধ্যাপক সেনগুপ্ত রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনায় নিযুক্ত আছেন। অধ্যাপক ঘটকের স্থলাভিষিক্ত হন অধ্যাপক শ্রীশঙ্কর দত্ত। শিক্ষকরূপে তিনি জন-প্রিয় ছিলেন। পরবর্তীজীবনে তিনি শিক্ষাবিভাগের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডীন অব স্টুডেন্টস ওয়েলফেয়ার পদে এবং পরে এশিয়াটিক সোসাইটি-তে বিভিন্ন দায়িত্বভার বহন করেন।

অর্থনীতি বিভাগে আমাদের প্রিয় অধ্যাপক ছিলেন শ্রীচিত্ত গুহ যিনি ক্লাসে তাঁর দায়িত্ব পালন করা ছাড়াও এন, সি, সি-র সকল দায়িত্ব অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে পালন করতেন। সংস্কৃত বিভাগের বিশিষ্ট কৃতী অধ্যাপক-

রূপে ডঃ অমলেন্দু বাগচী আমাদের সকলের বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি সংস্কৃত কলেজ ও ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন।

দর্শনের ছাত্র হিসেবে দর্শনাধ্যাপকদের কাছেই আমি সবচেয়ে ঋণী। দর্শনচর্চার প্রয়োজনে যাঁরা আমার মানসভূমিকে উর্বর ও সংবেদনশীল করে তুলতে সাহায্য করেছেন তাঁরা হলেন ডঃ শ্রী কালিকাপ্রসাদ রায়, শ্রীকালীপদ সেনগুপ্ত, শ্রীনবকুমার নন্দী, শ্রীনির্মলেন্দু রায় ও শ্রীঅমলেন্দু চক্রবর্তী। সুভাবিত ও সুগ্রন্থিত ছিল অধ্যাপক রায়ের বক্তৃতা। সুদীর্ঘ বিষয়বস্তুর যৌক্তিক গ্রন্থন ও উপস্থাপনে তিনি অনন্যসাধারণ ব্যুৎপত্তির পরিচয় দিতেন। ব্যঞ্জনাময় শব্দচয়ন ও বিষয়ের সাবলিলতা রক্ষায় তিনি সর্বদাই তৎপর থাকতেন। সুনির্বাচিত শব্দসম্ভারে পরিপূর্ণ তাঁর বক্তৃতা ছিল এক নিরবচ্ছিন্ন চিন্তাপ্রবাহ। এই শ্রদ্ধেয় আচার্যের অপত্যস্নেহ ও সনিষ্ঠ যত্ন ছাড়া পূর্বদৃষ্টান্তবিহীন কলেজ থেকে সে যুগে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হওয়া অসম্ভব ছিল। অধ্যাপক নন্দীর উদার সহযোগিতা আমার মনকে সমাজমুখী করে তুলতে সাহায্য করেছে। পরবর্তী জীবনেও বেশ কিছুদিন তাঁর অকৃপণ সাহায্য পেয়েছি। মূল্যবোধে বিশ্বাসী, অপার স্নেহ ও মমতায় ভরপুর অধ্যাপক সেনগুপ্ত সকল অবস্থায় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। এখনও অধ্যাপক নির্মলেন্দু রায়ের কাছ থেকে অগ্রজের অপার স্নেহ ও আন্তরিকতার ছোঁয়াচ পাই। নিজেকে সব সময়েই এঁদের বৃহত্তর পরিবারের একান্ত আপনজন মনে করি। এঁদের ঋণ অপরিশোধ্য।

। সমকালীন কিছু ঘটনা ।

কালের প্রেক্ষাপটে কিছু ঘটনার উল্লেখ প্রয়োজনীয় মনে করি। সক্রিয় প্রতিবাদী রাজনীতির সঙ্গে আমার পূর্ব যোগাযোগের কথা অনেকেই জানেন। কলেজে যোগদান করবার প্রথম বছরই আমি কোন রাজনীতির সংস্পর্শে আসিনি। তবে আমার জীবনের বাস্তব পরিবেশ ও অবস্থা এরূপ মানসিকতার জন্য প্রস্তুত ছিল। বিদ্যালয়ের শেষ বছরটিতে শিক্ষক নিয়োগের দাবিতে এক আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েছিলাম এবং সেই সময় সাম্যবাদী ছাত্ররূপে পরিচিত শ্রীপ্রবোধ রায়ের সান্নিধ্যে আসি। কলেজে প্রথম বছর ছাত্র সংসদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করি নিরপেক্ষভাবে। সংসদের প্রাক্তন সম্পাদক শ্রীপ্রদ্যোৎ দাশগুপ্ত আমাকে বিভিন্ন দায়িত্ব দিয়ে সাংগঠনিক কাজের প্রয়োজনীয় শিক্ষা দিয়েছিলেন। পরে বঙ্গাইগাঁওতে তিনি একটি নতুন বিদ্যালয় গড়েছিলেন। এরূপ প্রোৎসাহী প্রাণচঞ্চল মানুষটি আমাদের মধ্যে নেই, একথা ভাবতে মন বিষাদে ভরে উঠে। পরবর্তীকালে আমি প্রতিবাদী ছাত্র-আন্দোলনের পথিক নেতৃস্থানীয় কর্মীর ভূমিকা পালন করি। আমাদের সময় মেধাবী ছাত্রদের একটি বড় অংশ প্রকাশ্যে অথবা সংগোপনে এই আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে শ্রীসৌমেন্দ্র নাথ ঘোষ ও শ্রীপবিত্রকুমার ভট্টাচার্য্যের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। শ্রীঘোষ ব্যক্তিগত উচ্চাশা ও ক্রমোন্নতির পথে পরিক্রমা না করে সহরের একটি বিদ্যায়তনে কর্তব্যরত আছেন, যদিও আমি এখনও বিশ্বাস করি তাঁর পক্ষে মহাবিদ্যালয় কেন, কি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার জন্য উপযুক্ত বিবেচিত হওয়া খুব কষ্টসাধ্য ছিল না। এই সময়ে এক প্রতিবাদী পরিবেশ বিরাজ করছিল। আসামে বাঙালী বিরোধী আন্দোলন কুচবিহারের শান্ত পরিবেশকে উত্তাল করে তুলেছিল। খাদ্য আন্দোলনে কুচবিহারের গৌরবময় সংগ্রামও মনকে প্রবলভাবে

নাড়া দিত। এই সময়ই কুচবিহার রাস মেলার এক সার্কাসের তাবুকে জ্বালিয়ে দেবার ঘটনাকে কেন্দ্র করে পুলিশ কলেজে কাঁদানে গ্যাস ছোঁড়ে। অপ্রস্তুত বহু ছাত্র-ছাত্রী আহত হয়। আসামের আন্দোলন উদ্ভূত পরিস্থিতি সরোজমীনে তদন্ত করবার জন্য তদানীন্তন কংগ্রেস সভাপতি শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী কুচবিহারে এলে এক দুঃসাহসী তরুণ তাঁর হাতে কালো কাপড় পরিধানের জন্য তুলে দেয়। আমরা সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে কিছু প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করবার উদ্দেশ্যে যে স্থানে বর্তমানে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথের আবক্ষ মূর্তি স্থাপিত আছে সে স্থানে একটি রাজনৈতিক কার্টুন প্রদর্শনীর আয়োজন করি। ছবিগুলি এঁকেছিলেন ভ্রাতৃ-প্রতীম শ্রীসুবোধ সেন। এযাবৎ কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ মুহম্মদ সবের খাঁন আমার প্রতি সহৃদয় আচরণ করলেও বিরোধী ছাত্রদের প্রভাবে তিনি আমার প্রতি অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হন। আমাকে ডেকে ক্ষুব্ধকন্ঠে বলেন, "বলতে পার তোমার বিরুদ্ধে কেন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে না।" আমি অনাগত ঝড়ের পূর্বাভাস পাই। পরে তিনি আমাকে ও অপর একজন নেতৃস্থানীয় কর্মী শ্রীগৌরবরণ রায়কে কলেজ থেকে বিতাড়ণের উদ্দেশ্যে 'শো-কজ' নোটিশ দেন। এ নিয়ে তিনি অধ্যাপক, ছাত্র ও অভিভাবক মন্ডলীর অনেককেই ভাবিত করে তোলেন। তিনি কখনও আমার অভিভাবককে এবং কখনও আমার বিভাগীয় প্রধানকে আমার হয়ে তাঁর নির্দেশমত এক অঙ্গীকারপত্রে স্বাক্ষর করতে বলেন। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ছাত্র আন্দোলনও হতে থাকে। এই সময়ে প্রখর বুদ্ধি ও প্রবল তেজোদৃপ্ত তরুণ ছাত্রবন্ধুরা ছাত্র আন্দোলনে সামিল হন। এদের মধ্যে শ্রীইন্দ্রনীল ভট্টাচার্য, শ্রীঅমলেন্দু দাশগুপ্ত ও শ্রীসুভাষ মুখোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। সুভাষ ও অমলেন্দু আদর্শ চরিত্ররূপে এখনও পরিচিতজনের বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন। শাস্তিদান অসম্ভব বিবেচনা করে শ্রদ্ধেয় অধ্যাপকদের পরামর্শে তিনি অবশেষে তাঁর সম্মানার্থে আমাদের পাঁচটাকা জরিমানা করেন। সমাসন্ন পরীক্ষার কথা চিন্তা করে আমি এই শাস্তি মেনে নিই। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থানাধিকার করায় অধ্যক্ষ আমাকে ধন্যবাদ জানান। পরবর্তীকালে অনেকবার তাঁর সঙ্গে কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারে কথাবার্তা বলেছি।

বর্তমানে রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপমুক্ত জীবনযাপন করলেও, বিভিন্ন সামাজিক, শিক্ষামূলক ও অন্যান্য কাজে এখনও কলেজ জীবনে আহৃত অভিজ্ঞতার আলোকে আলোকিত হই। আমার পরিব্যাপ্ত জীবনে পরিবার অপেক্ষা কলেজের প্রভাব নিঃসন্দেহে গভীরতর।

পুরান সেই দিনের কথা

সৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

১৯৪১ সনের ২রা জুলাই জেঙ্কিন্স স্কুল ও ভিক্টোরিয়া কলেজের মাঝখানের খেলার মাঠটা পেরিয়ে কলেজে পৌঁছোলাম। কলেজের ছাত্রেরা রাতারাতি **Gentlemen** হয়ে যায়, তাদের ব্যক্তিসত্তা স্বীকৃতি পায়। কলেজে আই-এ ক্লাসে যখন ভর্তি হই তখন যেকথা আমার বিশেষভাবে মনে হচ্ছিল তা হল, আমার বাবা এমন এক সময়ে এখানে ছাত্র ছিলেন যখন আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল ছিলেন কলেজের অধ্যক্ষ। দাদা তখনও কলেজে চতুর্থ বর্ষের ছাত্র। কাজেই, কলেজের সঙ্গে আমাদের অন্য অনেকের মতই বংশানুক্রমিক সম্পর্ক। ছেলেবেলায় মার কাছে শুনেছি এ কলেজে এককালে এম-এ ও ল পড়ান হত। কিন্তু আমরা যখন ছাত্র তার বেশ ক বছর আগে আগুন লেগে ল্যাবরেটরী পুড়ে যাওয়ায় বি-এস-সি উঠে যায়। আমাদের সময়ে কলেজে বি-এ পর্যন্ত পড়ান হত। বিজ্ঞান শুধু ইণ্টারমেডিয়েট স্তরে ছিল। তা সত্ত্বেও কলেজের ঐতিহ্যে গর্ববোধ ছিল সর্বজনীন। শুধু আচার্য ব্রজেন্দ্র শীলই ১৬ বছর কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন না। ঐ পদ অলংকৃত করে ছিলেন পরবর্তীকালে হিজ হাইনেসরূপে আখ্যাত টি, এল, ভাসওয়ানীর মত মনীষী, ডঃ জয়গোপাল ব্যানার্জীর মত পাণ্ডিত। আমাদের অধ্যক্ষ শরৎ চন্দ্র গুপ্ত সেক্সপীয়রের নাটকের প্রথিতযশা অধ্যাপক ছিলেন।

বিজ্ঞান ও গণিতের সঙ্গে সুসম্পর্ক না থাকায় অবিমিশ্র আর্টস-এই আমার আশ্রয় ছিল। আমাদের কলেজে আর্টস-এর বহু ছাত্রেরই রসায়ন অন্যতম পাঠ্য ছিল। রসায়নের বিদায়ী অধ্যাপক ফণিভূষণ চট্টোপাধ্যায়ের শিক্ষণ নৈপুণ্য প্রবাদের মত ছিল। তাঁর শূন্য স্থানে যিনি এলেন তাঁর দায়িত্ব খুবই দুরূহ ছিল। কিন্তু তদানীন্তন তরুণ অধ্যাপক ডঃ প্রতুলচন্দ্র রক্ষিত সে শূন্যতা ছাত্র-ছাত্রীদের বুঝতে দেন নি। একথা সুবিদিত যে, ডঃ রক্ষিত প্রেসিডেন্সি কলেজের রসায়নশাস্ত্রের প্রধানরূপে অবসর গ্রহণ করেন।

অধ্যক্ষ শরৎ চন্দ্র গুপ্ত শুধু পাণ্ডিতই ছিলেন না, ছিলেন অত্যন্ত শান্ত প্রকৃতিরও। কিন্তু একদিন এই শান্ত মানুষের রুদ্ররূপ আমাদের প্রত্যক্ষ করতে হয়েছিল। তিনি আমাদের কাব্য পড়াতেন। একদিন পড়াতে পড়াতে হঠাৎ তাঁর নজরে পড়ে বহু ছাত্রেরই বই নেই। মঞ্চ থেকে নেমে এসে প্রত্যেক ছাত্রকে জিগ্যেস করতে শুরু করলেন, "**Where is your book ?**" বই নেই শোনার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর হুঙ্কার, "**Get out !**" মুখ শুকিয়ে গিয়েছে, গলা শুকিয়ে কাঠ, আট-দশজনের "**Get out**"-এর পর যখন আমার পালা এল তখন দাঁড়িয়ে প্রায় অস্ফুট স্বরে বললাম "স্যার' বই কিনতে পারিনি।" অধ্যক্ষ গুপ্ত একটু থমকে দাঁড়িয়ে এগিয়ে গেলেন। তারপরই আবার হুঙ্কার "**Get out !**" অথচ, কলেজে থাকতে নানা ঘটনায় বারবার তাঁর স্নেহশীল চরিত্রের পরিচয় পেয়েছি। কিন্তু এমন স্নেহশীল অধ্যক্ষকে নিয়েও রসিকতায় ছাত্রদের বাধত না। এ ব্যাপারে সেকাল একালে বড় একটা প্রভেদ নেই। অধ্যক্ষ গুপ্তের প্রতি বাক্যের শেষে "**Well**" বলা মুদ্রাদোষের মত ছিল। তাঁর "**Well**"-এর উচ্চারণও ছিল কিছুটা অনুনাসিক। সেভাবেই অনুকরণে ছাত্রদের আগ্রহ ছিল বেশী। কিন্তু এসব ব্যাপারে আমরা অগ্রচারী আদৌ ছিলাম না। আমাদের পূর্বসূরীদের প্রদর্শিত পথই আমরা অনুসরণ করেছি। এসব কিছু সত্ত্বেও ছাত্র-শিক্ষকের পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও স্নেহের সম্পর্কের উপর কোনও ছায়াপাত ঘটে নি।

আমাদের ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন দুজন। অধ্যাপক উপেন্দ্র নাথ রায় বাবারও অধ্যাপক ছিলেন। ইতিহাসের অপর অধ্যাপক চুনীলাল মুখোপাধ্যায় মূলতঃ ছিলেন অর্থনীতির অধ্যাপক। অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়ের বক্তৃতায় যতিচিহ্নের মত **'of course'** ব্যবহৃত হত। সেই সঙ্গে ছিল তাঁর গলা খাঁকারি। আই-এ ক্লাসে তিনি পড়াতেন গ্রীক ও রোমান ইতিহাস। পেলোপনেশীয় যুদ্ধ বা সীজারের বীর্যের কাহিনীকে উপেক্ষা করে একদিন এক পিরিয়ডে আমরা ৩৮ বার **'of course'** ও ৬৫ বার গলা খাঁকারির হিসেব করেছিলাম। তবে, প্রায় অর্ধশতকের ব্যবধানে সংখ্যার কিছু হেরফের ঘটে থাকতে পারে।

বাংলার একমাত্র অধ্যাপক দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ একাধারে লাইব্রেরীর ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক ছিলেন। অধ্যাপক ঘোষ একান্ত নির্বিরোধী হওয়ায় তাঁর ক্লাসে হট্টগোল একটু বেশী হত। একদিন এই হট্টগোল চরমে উঠল শেয়ালের ডাকে। দেবেনবাবু পড়ার মাঝখানে একটু বিরতি দিয়ে তাঁর প্রথাসিদ্ধ সাধুভাষায় বলে "উঠলেন," আমি একটি জন্তুবিশেষের ডাক শুনিতে পাইলাম। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ক্লাস যেন মন্ত্রবলে নিঃস্তব্ধ হয়ে গেল। পরে ঐ অপকর্মের জন্য দায়ী ছাত্রকে সহপাঠীদের কাছ থেকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার শুনতে হয়।

অধ্যক্ষ গুপ্ত ছাড়া ইংরেজী বিভাগে ছিলেন, অধ্যাপক প্রফুল্লরঞ্জন ধর ও অধ্যাপক অমূল্য রতন গুপ্ত। অধ্যক্ষ গুপ্ত ও অধ্যাপক ধর বাবারও অধ্যাপক। দাদা শ্রীরমেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ঐ সময়েই কলেজের ছাত্র। পি, আর, ডি, অত্যন্ত রাশভারী ছিলেন। তাঁর ইংরেজীও ছিল খুব কায়দাদুরস্ত। তাঁর মুখে "প্যারাডাইস লস্ট" অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ছিল। তাঁর ক্লাসে দেরীতে ঢোকার কোনও উপায় ছিল না। একদিন দেরীতে এসে কি করে ক্লাসে যাওয়া যায় ভাবতে ভাবতে দেখি একটা বেঞ্চ কিছুটা বেরিয়ে আছে। সেখানে বসে পড়া শুনলাম। অধ্যাপক ধর শেষে নাম ডাকতেন। আমার নাম ডাক হতেই **"Present, Sir"** বলে উঠেছি। এটাই যেন Signal-এর কাজ করল। **P.R.D**-এর কাছ থেকে যে 'tongue-loshing' পেলাম আমার ছাত্রজীবনে তা অভূতপূর্ব। তাঁর মোট কথা, আমি চোরের মত পারসেন্টেজ নেওয়ার চেষ্টা করেছি। পরবর্তী জীবনে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে তাঁর কাছ থেকে অত্যন্ত সস্নেহ ব্যবহার পেয়েছি। কিন্তু সেদিনের অন্যায় তিরস্কারের কথা কিছুতেই ভুলতে পারি নি। অধ্যাপক অমূল্যরতন গুপ্তের এরকম লৌহকঠিন শৃঙ্খলার খ্যাতি ছিল না। তাই বলে তাঁর ক্লাসে কোনও বিশৃঙ্খলাও ঘটত না। শুধু গ্যালারীতে তিনি যখন Prosody-এ শেখাতে গিয়ে Scousion করাতেন তখন তাঁর সঙ্গে ছাত্রেরা জুতো ঠুকে ঠুকে তাল দিয়ে 'Scausion' আরম্ভ করার চেষ্টা করত, যাতে দুরূহ ইংরেজী ভাষায় ১০ নম্বর করায়ত্ত হয়।

আমাদের কলেজের প্রথম বর্ষে কলেজের ছাত্র ইউনিয়ন নির্বাচনে পুলিশী হস্তক্ষেপ ঘটে। তৃতীয় বর্ষের ছাত্র আমার দাদা রমেন্দ্রনাথ এই নির্বাচনে সাধারণ সম্পাদক পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হন। দাদার রাজনীতিক, সংস্রবের অভিযোগে কলেজ কর্তৃপক্ষকে দিয়ে দাদার উপর এমন চাপ দেওয়া হয় যে, দাদা, সাধারণ সম্পাদক পদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে নাম প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হন। এই ঘটনা তাঁকে বিশেষভাবে আহত করেছিল। এ ধরনের ঘটনা ভিক্টোরিয়া কলেজে অভূতপূর্ব। যে রাজনীতিক আন্দোলন একবছরের মধ্যে কলেজে তথা রাজ্যে প্রভাববিস্তার করে এঘটনা তারই সূচনাপর্ব বলা যায়।

আমাদের কলেজের প্রথমবর্ষে নিঃসন্দেহে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা রবীন্দ্রনাথের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ। রবীন্দ্রনাথের মুমূর্ষু অবস্থা গোটা দেশকেই, বিশেষ করে বাংলাদেশকে পরমাত্মীয় বিয়োগ আশঙ্কায় বিচলিত করে তুলেছিল। তখন ঘরে ঘরে রেডিও ছিল না। সবাই সংশয় দোলায় ছিলাম। ইতিহাসের ক্লাস, অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ রায় নিচ্ছিলেন। হাতে নোটিশ, বেয়ারা ঢুকলো একবার সেদিকে তাকিয়ে অধ্যাপক রায় এই প্রথম ক্লাসে বাংলায় বললেন, "রবীন্দ্রনাথ নেই। আজ পড়া হবে না।" বলে বই বন্ধ করে চলে গেলেন। সমস্ত কলেজেই যেন গভীর নিঃস্তব্ধতা নেমে আসল। তারই রেশ টেনে আপন মনে ঘুরতে ঘুরতে থমকে দাঁড়ালাম। কাজী নজরুলের এযেন অন্তরের অন্তঃস্তল থেকে উৎসারিত বানী ঃ

"বাইশে শ্রাবণ এল দুর্যোগের ঘন অন্ধকারে।"

সব দেশীয় রাজ্যের মতই কোচবিহারেও ছিল রাজনীতি করতে মানা। তা বলে মানুষের মন থেকে বিশেষতঃ ছাত্র-যুবাদের মন থেকে জাতীয় আন্দোলনের ছাপ মুছে দেওয়া যায় নি। কিন্তু এতদিন প্রয়াত দেবী নিয়োগী, শ্রীঅরুণ ভট্টাচার্যের মত যাঁরা প্রত্যক্ষ রাজনীতি করতেন তাঁদের কর্মক্ষেত্র ছিল রাজ্যের বাইরে। কিন্তু সে বাঁধ আর থাকছিল না। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আপসবিরোধী সংগ্রামের প্রশ্নে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে গান্ধীজীর বিরোধে দেশের তরুন যুবকদের বিপুল সমর্থন সুভাষচন্দ্রের দিকেই ছিল। সুভাষচন্দ্রকে কংগ্রেস থেকে ৬ বছরের জন্য সাসপেন্ড করা হলে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে গোটা দেশ মুখর হয়ে ওঠে। কোচবিহারেও তার প্রতিফলন হয়। ১৯৪১ সালে আমাদের ম্যাট্রিক পরীক্ষার কিছুদিন আগে সুভাষচন্দ্রের দেশত্যাগের ঘটনা ঘটে। সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধানে দেশব্যাপী যে আলোড়ন সৃষ্টি হয় দেশীয় রাজ্য বলে কোচবিহারের মানুষও তার ব্যতিক্রম ছিল না।

আদর্শ পাঠাগারে হারুদার (শ্রী হরিপদ মুখোপাধ্যায়) পরিচালনায় স্বাদেশিকতার পাঠ হত। গান্ধীজী যুদ্ধে বিরত ইংরেজদের উপর চাপ সৃষ্টি না করার নীতি পরিত্যাগ করে ১৯৪২ সনের ৮ আগষ্ট বোম্বাই-এর গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক ময়দানে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রতি আহ্বান জানালেন 'ভারত ছাড়' এবং দেশবাসীকে বল্লেন, 'হয় কর, নয় মর' 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে' বা 'Do or die' ৮ তারিখ মধ্যরাতে গান্ধীজী, জওহরলাল, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, মৌলানা আজাদ, খান আবদুল গফ্ফর খাঁন প্রমুখ বহু কংগ্রেস নেতা ব্রিটিশের হাতে বন্দী হন। নানা দলের অগণিত রাজনীতিক নেতা ও কর্মী কারান্তরালে নিক্ষিপ্ত হন। সঙ্গে সঙ্গে দেশের মানুষ আসমুদ্র হিমাচল প্রতিবাদে গর্জে উঠে। ইংরেজের যুদ্ধকালীন সেন্সরশিপ সত্বেও সে সময় কিন্তু অসমসাহসিক সংগ্রামের কাহিনী চাপা থাকে নি।

বাংলাদেশেরও প্রত্যন্তে অবস্থিত এবং রাজনীতিক দিক দিয়ে বাংলাদেশ থেকে আপাতদৃষ্টিতে বিচ্ছিন্ন কোচবিহারেও এই গণ আন্দোলনের ঢেউ পেঁছোয়। দাদা রংপুরে মাসতুতো দাদার বিয়ে উপলক্ষ করে ইস্তাহার ছাপাতে যান, ইস্তাহার ছাপানো যায় নি। কিন্তু ফেরার পথে দাদা লালমনিরহাটে গ্রেফতার হন। হারুদা দাদার গ্রেফ্তারের খবর দিলেন। কোচবিহারে হারু রমেনের নাম একসঙ্গে উচ্চারিত হত। পুলিসের খাতাতেও তাই।

দাদার গ্রেফ্তারের খবর যেদিন পেঁাছাল সেদিন পোস্টার দিয়ে পরদিন কলেজে ছাত্র ধর্মঘট ডাকা হল। সেদিনই প্রাতঃকালে বাড়িতে পুলিস হানা দিল। পরে জানি আরও ১০,১২ টি বাড়িতে একই রকম হানা দেয়।

আমাদের পুলিস অফিসে বেলা দুটো পর্যন্ত প্রশ্নাদির নামে আটকে রাখা হয়। পরে বুঝি, ছাত্র ধর্মঘট বানচাল করার জন্যই এভাবে আমাদের আটকে রাখা হয়। পরদিন একবন্ধু কলেজে বলল, "তোরা তো famous হয়ে গেলি।" বন্ধুবর বৈদ্যনাথ চক্রবর্তীর প্রতিক্রিয়া ঃ "তোরা যে কস famous, পুলিসে যে কয় notorious."

তখনও কোচবিহারে রাজনীতিক কারণে গ্রেফ্তার শুরু হয় নি। তাই পুলিসকে বলে বয়ে সন্দেহভাজনদের বাইরে পাঠাত। বাবা আগাস্ট মাসেই দার্জিলিং-এর কাছে সুখিয়াপোখরিতে আমাকে কাকার কাছে রেখে আসেন। কাকা ছিলেন পোস্টমাষ্টার, কোয়ার্টার পোস্ট অফিসের উপরে। সেখানে যখন পোস্ট অফিসে আগুন লাগার ঘটনা ঘটল তখন সেখান থেকে তাড়া খেয়ে আবার কোচবিহারে ফিরে আসি, যেখানে অভ্যর্থনা সমিতি তৈরীই ছিল। স্টেশন থেকে সোজা পুলিস অফিসে নিয়ে ২৪ ঘন্টার মধ্যে কোচবিহার থেকে বহিষ্কারের আদেশ দেওয়া হল। নামে ২৪ ঘন্টা হলেও কার্যতঃ ৮ ঘন্টা দাঁড়াল, কারন, পরদিন যে সময়ে ট্রেন তাতে ২৪ ঘন্টার মেয়াদ ভঙ্গ হয়। দুপুরে কলেজে গিয়ে সকলের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হল। অধ্যক্ষ গুপ্তের সঙ্গে দেখা করলাম। খবর সবাই পেয়ে গিয়েছিলেন। তিনি সস্নেহে বললেন, আমার পরীক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে সবরকম সাহায্য করা হবে।

কোচবিহার ভিক্টোরিয়া কলেজে আমার ছাত্র জীবনের এখানেই ইতি। বলতে গেলে আমার ছাত্রজীবনেরই এখানে ইতি। এরপর কলেজে পড়লেও ছাত্রজীবনের সেই স্বাদ আর পাই নি। আমার জীবনে রাজনীতিক আন্দোলনের প্রথম পাঠ এই ভিক্টোরিয়া কলেজেই গ্রহণ করি। তাই এ কলেজের সঙ্গে চিরকাল এক আত্মিক-বন্ধনে বাঁধা আছি।

শত বরষের গান

সুবোধ তালুকদার

আজি শুভ দিনে পুণ্য লগনে
সবারে করি আহ্বান—
এসো এসো সবে মিলনোৎসবে
গাহি শত বরষের গান।

বাঁজাও বাঁজাও মঙ্গল শাঁখ, জ্বালাও নূতন আলো,
দীপশিখায় জ্বালায়ে দীপ, শত-প্রদীপ জ্বালো।
দূর হয়ে যাক যত অমানিশা, দূর হোক যত কালো,
শত বরষের শিখায় শিখায় জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালো।
এসো এসো সবে আনন্দ-গানে ভরিয়া তোলো প্রাণ-
মিলনের মাঝে এসো তুলি সবে আনন্দ-একতান।

আজি হতে শতবর্ষ আগে, নৃপেন্দ্র নারায়ণ,
'ভিক্টোরিয়া' নামে গড়িলেন এই বিদ্যানিকেতন,
প্রদীপ জ্বালাতে আনিলেন হেথা আচার্য ব্রজেন শীলে
তাঁহারি নামে আজো সে প্রদীপ শত-শিখায় জ্বলে।

শতবরষের স্মৃতিঘেরা এ বিদ্যাতীর্থ অঙ্গন,
কত মনীষীর পুণ্য ছোঁয়ায় পূত এ প্রাঙ্গন।
প্রবীণের সাথে মিলিয়া নবীন এস রচি নবতান,
স্মৃতির আঁখরে লিখে যাই এসো, আমাদের যত গান,
সবারে করি আহ্বান।

শতবর্ষ উপলক্ষ্যে এই সংগীতটি রচিত, সুরারোপ করেছেন শ্রীলোকেশ ভট্টাচার্য।

কবি হরপ্রসাদ মিত্রের কবিতা

১

সে

সেই খিদে নেই, তেষ্টাও নেই,
লোভ নেই, নেই লালসা,
আগে যা যা তার ছিল, — কিছু নেই,
আছে তবে কোন ভরসা ?
কিভাবে লোকটা বেঁচে আছে, সে তো দেখছি।
সত্যি প্রাণের কথাই বলছে, —
স্বকর্ণে সবি শুনেছি।
পায়নি বাহবা। বরং কিছু তো ধিক্কারই ছিল ভাগ্যে,
তবু ভগবান দেখছেন, কোনো বিকল্প নেই সত্যি।
—এই একান্ত বিশ্বাস তার
বলে থাকে দিনে রাত্রে।
কেউ কেউ তাকে ভালবেসেছিল,
অনেকে করেছে হিংসে,
যখন যে নারী হৃদয়ে এসেছে
সে-ই করে গেছে রক্ষে।
তবে, সময়ের স্বভাব সকলি অবসানমুখী করবার,
কোনো মোহ নেই এ-সারকথা না ধরবার।
মৃত্যুতে তার পরোয়াই নেই,
যখন সে থাকে গম্ভীর,
দেখি তাকে যেন শীতের দুপুরে ভুবনেশ্বর-মন্দির।
অথবা উপমা বদলেই বলি —
কিশোরীর দিকে তাকিয়ে
শীর্ণ বিধুর নদীটিকে দেখে
সাগরে পড়তে ঝাঁপিয়ে।
যেন একযোগে আকাশস্পর্শ
ধু ধু দিগন্তবিস্তার —
আপন বৃত্ত ছাড়িয়ে তামাম দুনিয়াতে মিলমিশ তার।

কবি হরপ্রসাদ মিত্রের কবিতা

২

কাকতাড়ুয়ার জন্যে

খুব বড়ো কোনো মন কাছে নেই, — তাই
তামাম-ভারতে রোজ কা কা করে ষাট-হাজার কোটি কাক।
যদি ঠিক যা যা ঘটছে ভেতরে
সবি বলা যেতো ঠিক,
ঝরাপাতা আর আগুনের ছাই, পথের পাথরকুচি
এক হয়ে হোতো উদারা মুদারা তারা —
যেন মিক্‌সারে পাশের বাড়িতে চলছেই রা - রা - রা।

কাকতাড়ুয়াটা কালো হেঁড়ে মাথা
লম্বা খুঁটিতে চুপ।
মাঠে বিটকেল চেহারাটা তার
চোখ মুখ তার চুন।
কেউ তোয়াক্কা করেই না তার
শোনেই না, — শুনবে কি?
কখনো কি তেড়ে বলতে পেরেছে
— 'হুশ্‌, তোরা উড়ে যা'?

কবি হরপ্রসাদ মিত্রের কবিতা

৩

নলডেরাতে

জঙ্গলে নয়, পাহাড়পথে বাঁকের পরে বাঁক,
দাঁড়িয়েছিল পাইনসারি রোদ্দুরে চুপচাপ।
গিয়েছিলুম ভোরবেলাতেই আমরা কয়েকজনে,
নলডেরাতে গলফ-ময়দান। চা-পান সেখানে।
সামনে ঢালু দিগন্ত দূর। ফুটকি ফুটকি ছায়া—
ভরদুপুরের গাছ সেগুলো। ছায়ায় কী আরাম!

স্যান্ডউইচের টুকরো খেতে ঘাসের জাজিমে
কাঠবেড়ালী এসেছিল, খয়েরি পাখিরাও।
পীচ গাছটায় সবুজ সবুজ শক্ত ফলের গুটি—
দাঁত বসে না, থু থু করে ফেলতে হোলো সব।

প্রায় অদৃশ্য কার্যকারণ-সুতোয় সবি বাঁধা।
কূল মেলেনা নিজের এবং থই মেলেনা কারো।
বর্তমানের এপার-ওপার তত্ত্বকথাই শুধু।
অতীত শুধুই স্মৃতি এবং ভবিষ্যৎ কে জানে?
নলডেরাতে আমরা ক'জন ভেবেছি এই কথা।